আড়াই চাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছেলেবেলা হইতে তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তার খ্যাতি-প্রশংসার 'আওতায়' বাড়িয়া, অমলের বুদ্ধির ধারটা, বাস্তবিকই কিছু অনন্যসাধারণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে চেহারাটি ছিল পিতৃমাতৃদত্ত নামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, সুতরাং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শান্ত গম্ভীর স্বভাব পিতার অগোচরে এবং স্বভাবতঃ নিরীহ ভালমানুষ মাতার অসংযত প্রশ্রয়ে সে অল্পে অল্পে সৌখীন বিলাসচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিল। তবে প্রশংসাহানির ভয়ে সে পড়াশুনায় কখনও অবহেলা করিত না। এবং সেই একমাত্র সর্ব্বদোষহর সুনামের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া, পরম স্ফূর্ত্তির সহিত দিন কাটাইয়া সে যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল, তখন অজস্র আদর ও যথেচ্ছ আবদারে সুবিধাদাত্রী মাতার নিকট হইতে নিজের দৃষ্টিপীড়ার বাহানায় সোনার চশমা এবং সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রবল আবশ্যকতার অজুহাতে সৌখীন রিষ্টওয়াচ কিনিবার টাকা আদায় করিয়া লইল। অবশ্য ভবিষ্যৎকালে দেখা গিয়াছিল যে জিনিস দুইটির মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে তাহার যত মনোযোগ না থাক, কিন্তু জিনিষ দুইটির পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহারে তাহার এমন অখণ্ড মনোযোগ ছিল যে, একমাত্র

স্নানের সময় ছাড়া সে চশমাযোড়াটি চক্ষুচ্যুত বা রিষ্টওয়াচটি হস্তচ্যুত করিত না। ঘুমাইবার সময়ও না!

তার পর আঠারো বৎসর বয়সে এফ-এ পাশ করিয়া সে যখন কলিকাতায় বি-এ পড়িতে আসিল, তখন নিঃসংশয়ে আপনাকে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের সমীপস্থ একজন বলিয়া গণ্য করিয়া লইল। আত্মীয় স্বজনের 'আহা', বন্ধুবর্গের 'বাহা' এবং পাড়াপ্রতিবেশীর সম্ভ্রম-মুগ্ধ দৃষ্টির 'মরি মরি' ভাবব্যঞ্জক বিস্ময় দেখিয়া তাহার মস্তিষ্কযন্ত্রে অস্বাভাবিক বিপ্লব বাধিয়া গেল। আত্মশ্লাঘায় ও বিলাসচর্চ্চায় সে নিজের ইচ্ছাতৃপ্তিবিষয়ে পুরামাত্রায় খাতির নদারৎ হইয়া পড়িল। স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন পিতা, বিদেশবাসী পুত্রকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ দিতেন; তাহার উপর মাতৃদেবীরও অনুগ্রহ ছিল। দ্বাপরের দাতাকর্ণের সহিত জননীর পিতৃকুলের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল কি না ইতিহাসে তাহার প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার দানমাহাত্ম্য দেখিলে সাধারণের পক্ষে আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিবার যো ছিল না। সৌখীন ছেলের যথেচ্ছ সখের খরচ যোগাড় করিতে তিনি জলে ডুবিতে আগুনে পুড়িতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না, সুতরাং এহেন সুযোগ-সমবায়ে সৌখীনতাপুষ্ট অমলচন্দ্রের বিলাসচর্চ্চার মাত্রা যে কতদূর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অমলের বেশভূষার অযথা ব্যয় বাহুল্য দেখিয়া, আত্মীয়কুটুম্বগণ গোপনে তাহাকে ক্ষুদ্র নবাব বলিয়া ডাকিতেন, এমন কি তাহার অতি সৌখীন বন্ধুগণও তাহার চালচলনের অসহ্য বাড়াবাড়ি দেখিয়া সময় সময় উপহাস করিতে ছাড়িত না। কিন্তু সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বে-পরোয়া ও বে-দরদী অমলচন্দ্রের তাহাতে বিশেষ কিছু আসিত যাইত না। চশমার ভিতর হইতে নিঃশব্দ অবজ্ঞার মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়া উপহাসকারিগণের হৃন্মর্ম্ম বিদীর্ণ করিয়া অমলচন্দ্র

দ্বিগুণ উদ্যমে বেশ পারিপাট্যের উন্নতি ও সংস্কার সাধনে মনোযোগ করিত। বন্ধুরা অন্তরালে চোখ টেপাটেপি করিয়া হাসিত।

অমলের পিতৃকুলের নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়গণের মধ্যে সাধারণতঃ নিরেট মূর্খ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য কেহ ছিল না। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমান্ অমলচন্দ্র জানিত, লেখাপড়া শিখিলেও তাঁহারা প্রায় অশিক্ষিত ও সেই মাত্রায় অপদার্থ! অমলের পিতাও বি-এ গ্র্যাজুয়েট। হোসেঙ্গা-বাদে জজকোর্টে সুখ্যাতির সহিত ট্র্যান্স্লেটারের কায করিয়া মাথার চুল পাকাইয়া আজিও তিনি অনেকগুলি টাকা গৃহে আনিতেছেন, এবং তাহারই কিয়দংশ হইতে অমলচন্দ্রের অবাধ বাবুয়ানার খরচ জুটিতেছে। সুতরাং পিতার শিক্ষা ও জ্ঞান সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে কোন কথা বলিবার সাহস না থাকিলেও, অমল কথাচ্ছন্দে অনেক সময় পূর্ব্বকালের অসম্পূর্ণ শিক্ষার সহিত আধুনিক কালের অত্যদ্ভুত উচ্চ শিক্ষার তুলনায় সমালোচনা করিতে ছাড়িত না। অধিক কি, সে কলিকাতা গিয়া বি-এ পড়িতে আরম্ভ করিবার বছর চার পূর্ব্বে তাহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র সতীশ বাবু ওরফে 'মেজদা' সংজ্ঞাধারী যে নিতান্ত সাধারণ চালের ভদ্রলোকটি বিনাড়ম্বরে সোজাসুজি পড়িয়া শুনিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীর এম-এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং এখন কলিকাতারই কোন সুবিখ্যাত কলেজে উপযুক্ত বেতনে প্রোফেসারী করিয়া স্বচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহারও বুদ্ধিবিদ্যা সম্বন্ধে অমলের মনে ঘোরতর সন্দেহ ও প্রবল অবজ্ঞা ছিল। অমলের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, সে ইচ্ছা করিলে উক্ত মেজদাকে এখনও দুই-দশ বছর শিক্ষা দিয়া প্রোফেসারীর উপযুক্ত অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক করিয়া তুলিতে পারে! সেই জন্য পিতার আদেশ ও মেজদার সাদর অনুরোধে বাধ্য হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত মেজদার কলিকাতার বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে

রাজী হইলেও—মেজদা যে কলেজে প্রোফেসারী করেন, সে কলেজে পড়িতে কোন মতেই সম্মত হইল না। অনেক তর্ক দ্বন্দ্বের পর মেজদারই শরণাগত হইয়া তাঁহারই অকাট্য যুক্তিসাহায্যে পিতার আপত্তি খণ্ডন করিয়া অন্য কলেজে স্থান লইয়াছিল। সদা কর্ম্মব্যস্ত মেজদার কলেজের কাম ছাড়া সকাল সন্ধ্যায় দুই জায়গায় ছেলে পড়াইবার জন্য ছুটাছুটি করিতে হইত, তাহার উপর বাড়ীতে আর দুইটি ভাইয়ের ও অন্য কতকগুলি দরিদ্র কুটুম্বসন্তানের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিতে হইত। খুল্লতাত-পুত্র অমলচন্দ্রের উপর তিনি সর্ব্বক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না, তবে সময় বিশেষে তাহার পড়াশুনার খোঁজ খবর লইতেন। মেজদার এই অনধিকার চর্চ্চার স্পর্দ্ধায় অমল মনে মনে অত্যন্ত চটিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কয়মাস কলিকাতা-বাসের পর বড়দিনের ছুটির সময় হোসেঙ্গাবাদ ফিরিয়া গিয়া অমল শুনিল, উক্ত মেজদার লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী উকীল শ্বশুরের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ হইতেছে। মেয়েটি নাকি পরমা সুন্দরী। এ বিষয়ে ঘটক স্বয়ং মেজদা, এবং কথাবার্ত্তা চলিতেছে উভয় পক্ষের কর্ত্তায় কর্ত্তায়।

বলা বাহুল্য, প্রস্তাব শুনিয়া অমলের হাড় জুড়াইয়া গেল! মেজদার অন্তঃপুরচারিণী অবগুণ্ঠনকুণ্ঠিতা লজ্জাশীলা গৃহলক্ষ্মীর কথা স্মরণ করিয়া অমলের মন আরও বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল—'ক্যাডাভারাস্' বলিয়া সে বিকৃত মুখ ফিরাইল। ইচ্ছা হইল, কলিকাতার সুবিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে

অল্পদিন পূর্ব্বে দেখা, "জনা" অভিনয়ের মহাবীর প্রবীরের মত ক্ষুব্ধ পরিতাপে বীরদন্তে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে—

চলে যাই লোকালয় ত্যজি !—

লোকালয় ত্যাগ করিয়া যাইবার মত পছন্দসই স্থান তখন চোখের সামনে তেমন কিছু না থাকায় অগত্যা বাধ্য হইয়া অমলচন্দ্র লোকালয়েই রহিয়া গেল। কিন্তু বাঙ্গালী সন্তান বলিয়া যে অম্লান বদনে অপমান সহ্য করিয়া, পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিবে,—গ্র্যাজুয়েট-গৌরবলাভ-চেষ্টিত অমলচন্দ্রের পক্ষে তাহা অসম্ভব। সাধারণ বাঙ্গালী-গৃহের ভোঁতাবুদ্ধি নারীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া, মেজদার মত সুস্থ স্বচ্ছন্দমনে, নির্ব্বিবাদে দাম্পত্য-ধর্ম্ম পালন করা তাহার দ্বারা হইবে না, হইবে না, হইবে না !...... না হউন মেজদার স্ত্রী কালো কুৎসিত, না পরুন তিনি নথ ও মল, এবং না বলুন তিনি গ্রাম্য বুলি,—কিন্তু তবু তিনি উচ্চশিক্ষিত অমলের মত ব্যক্তি-বৃন্দের রুচিনির্দ্দিষ্ট আদর্শ রমণী নামের অযোগ্যা, সম্পূর্ণ অযোগ্যা ! ঘোমটা টানিয়া রাত্রিদিন সাংসারিক কাযকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিয়া পরিবারস্থ সকলের মন যোগাইয়া চলার ক্ষমতাটুকু তাঁহার যতই আশ্চর্য্য রকম থাক, এবং বাটীতে কাহারও অসুখ হইলে তাহার পা-টেপা হইতে ঔষধ খাওয়ান ও পথ্য প্রস্তুত বিষয়ে তাঁহার যতই দক্ষতা ও প্রশংসনীয় ধৈর্য্য থাক,—তথাপি, হায় রে, উচ্চশিক্ষিত স্বামীর হৃদয়মনের ক্ষুধা-বিনাশিনী বিশেষত্ব তাঁহার মধ্যে কোথায়? মেজদার ন্যায় মানুষগুলির পত্নী-দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া একেই ত সে মনে মনে মর্ম্মাহত ও অনুতপ্ত হইয়া আছে, তাহার উপর আজ কি না সেই মেজদারই স্ত্রীর ছোট বোনটিকে তাহার স্কন্ধে চাপাইবার উদ্যোগ! কি নৃশংস ষড়যন্ত্র, কি ভয়ানক শত্রুতা !—রাগে অমলের চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। দেশের রাজা তেমন কোন্ আইন করেন নাই, তাই নিরুপায়, নচেৎ

অমল বোধ হয় তদ্দণ্ডেই একটা সঙ্গীন ফৌজদারী মামলা আনাইয়া হুলুস্থূল বাধাইয়া বসিত !

যাহাই হউক, ক্রোধোৎক্ষিপ্ত চিত্তে, সজোরে গোঁফে তা দিয়া এবং প্রাণপণে মাথা খাটাইয়া অবশেষে এই দুর্দ্দৈব প্রতীকারের চরমপন্থা অমল আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, এবং দ্রুতপাদক্ষেপে সটান জননীর কাছে আসিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "মা, তুমি বাবাকে বোলো, হয় তিনি বিয়ে দেন, নয় আমি বি-এ দিই !—"

মা প্রথমটা অবাক হইয়া ছেলের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে অনেক কষ্টে সেই দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালির মর্ম্মার্থ উদ্ঘাটিত হইলে শঙ্কিতা জননী বুঝিলেন, কামিনী-কাঞ্চনের সংস্রবে আসিলে তাঁহার সুদুশ্চর-তপস্যা-পরায়ণ সৌখীন পরমহংস পুত্রের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে সাক্ষান্মোক্ষলাভ অসম্ভব হইবে, অতএব অমলের পিতা যদি—

যথাসময়ে অমলের পিতা সমস্ত শুনিলেন। বিলাসী পুত্রের সৌখীনতা-চর্চ্চার প্রবল আতিশয্য দেখিয়া, ইতিপূর্ব্বে তিনিও বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে পুত্রবধূ গৃহে আসিলে, পুত্র সেই সজীব মানুষটিকেও সম্ভবতঃ তাহার সখ-পরিতৃপ্তির একটি সচেতন আসবাব বলিয়া ঠাহর করিয়া বসিবে, এবং সেই উপলক্ষে শুধু যে ছেলের কলেজের পড়াশুনা মাটী হইবে তাহা নহে—গৃহের মধ্যেও হয়ত পারিবারিক শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে। এবং তাহাতে যে শুধু বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণীকেই জ্বালাতন হইতে হইবে, এমন নহে, পুত্রবধূস্থানীয়া সেই নিরপরাধ পরের মেয়েটিকেও হয়ত অনেক দুঃখ-লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে। ঘরে ঘরে ইহার নজীরের অভাব নাই। বেশী দূর নহে—ঐ অমলেরই কলিকাতা অঞ্চলবাসী জনৈক মাসতুত ভাই নবকান্তও ঐরূপে একযোগে বিদ্যা ও বিলাসের আরাধনা করিতে করিতে, কোন গতিকে এণ্ট্রান্সের গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া যেমন

কলেজে ঢুকিয়াছে, অমনি পিতার অনুগ্রহে গৃহমধ্যে বধূর আবির্ভাব হওয়ায় ব্রাহস্পর্শ যোগে ছেলেটির মাথা বিগড়াইয়া গেল, কাযেই মা সরস্বতী লজ্জায় অন্তর্হিতা হইলেন। ছেলেটি উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতায় মাতিয়া এখন এমন অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছে যে সেই বিলাসজীর্ণ দেহ মন লইয়া সংসারের কোনও কায করিবার শক্তিও তাহার আছে কি সন্দেহ!

দেখিয়া-শেখা অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করিয়া, ঠেকিয়া শিখিবার কৌতূহল প্রকাশ করিয়া নূতন কেলেঙ্কারী সৃষ্টি করিতে অমলের পিতার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, অমল উপার্জ্জনশীল না হইলে তাহার বিবাহ দিবেন না। কিন্তু সম্প্রতি ভদ্র-লোক কুটুম্বগণের প্রস্তাবে, উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র সতীশচন্দ্র কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি চক্ষুলজ্জার খাতিরে মত ফিরাইয়াছিলেন, এখন মাঝখান হইতে অঙ্কুশাহত মত্ত হস্তীর মত ক্ষোভোত্তেজিত পুত্রের ক্রোধহুঙ্কার শুনিয়া তিনি পরম নিশ্চিন্ত হইলেন। ঈষৎ হাসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "অমলকে বোলো, তার অমতে আমি বিয়ে দেব না।"

অমল ঠাণ্ডা হইয়া কলিকাতায় ফিরিল। মনে মনে ভাবিল যে মেজদা এবার নিশ্চয়ই পিতাকে ছাড়িয়া, তাহার তোষামোদ আরম্ভ করিবেন, এবং মেজবৌদিও তাঁহার বোনটীর সদ্গতিবিধানের জন্য অমলের প্রচুর স্তবস্তুতি করিতে থাকিবেন, কিন্তু বীরাগ্রগণ্য অমলচন্দ্র অটল অচল হৃদয়ে পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত, 'কোরা' 'কোরা' বাৎ শুনাইয়া তাঁহাদের আশায় বজ্রাঘাত করিয়া বিজয়গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া দিন কাটাইবে। চাই কি, এই সুযোগে কোন ছল করিয়া অমল মেজদার বাসা ছাড়িয়া মেসে গিয়া স্বাধীন আনন্দেও দিন কাটাইতে পারিবে, এবং পিতার কাছেও বেশ যুক্তিযুক্ত কৈফিয়ত দিয়া নিজের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চরিত্রের মহিমা বিঘোষিত করিতে পারিবে!

কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া হতাশ হইয়া অমল দেখিল—চারিদিকেই নিঝুমের পালা!—অনুমানে বুঝিল, ঘটক মেজদাকে পিতা খোলাখুলি জবাব দিয়াছেন, সেই জন্য মেজদা তাহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিতেছেন না। আত্মগৌরবে অমলের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, কিন্তু মেজদার বাসা ছাড়িবার সুযোগ না হওয়ায় মনে বড় দুঃখ হইল। অগত্যা সেখান হইতেই কলেজে আবার যাতায়াত সুরু করিল, এবং ইদানীং পূর্ব্বাপেক্ষা সতর্কতার সহিত অন্তঃপুরে মেজ বৌদির ছায়া এড়াইয়া চলিতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইত যে সমস্ত বিশ্ব সংসারটা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে হাঁ করিয়া অহর্নিশি শুধু তাহার আশ্চর্য্য সুন্দর চেহারা নিরীক্ষণ ও মনোহর গুণগরিমা মনে মনে আলোচনা করিতেছে! কাযেই বাধ্য হইয়া অমল এখন উঠিতে, হাঁটিতে, চলিতে, ফিরিতে সর্ব্বদাই অতিমাত্র সজাগ থাকিত। তাহার বিংশবর্ষীয় জীবনের অভ্যস্ত হাঁচি কাসি গুলাও এখন প্রত্যহ নব নব রূপে তাহার নিজেরই কাণে অলৌকিক ভাবব্যঞ্জনায় আশ্চর্য্য বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। মোট কথা নিজেকে লইয়া অমল অষ্টপ্রহর এমন ব্যস্ত বিব্রত হইয়া পড়িল যে, পড়া-শুনায় নিয়মিত মনোযোগ রক্ষা করায় বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মের ছুটির পূর্ব্বে, অমলদের কলেজের ছেলেরা 'হরিরাজ' নাটক অভিনয়ের বন্দোবস্ত করিল। অমল মহা উৎসাহে এই উৎসবে কায়মন-প্রাণ ঢালিয়া দিল, স্বয়ং হরিরাজের পাঠ অভিনয় করিবার ভার লইল। প্রতিজ্ঞা করিল, ঐ ভূমিকা সে 'জ্বালাইয়া' দিবে!

মেজদার বাসার ঘরে যথেচ্ছ ভঙ্গিতে হাত পা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া আক্ষেপোন্মত্ত হরিরাজের প্রচণ্ড হৃদয়োচ্ছ্বাসের উদ্দীপনা অভ্যাস করা চলে না। অমল গোপনে খুঁজিয়া পাতিয়া, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে একটা অখ্যাত নামা মেসের ত্রিতলস্থ ক্ষুদ্র কক্ষটি এক মাসের জন্য ভাড়া লইল। আহারাদির ব্যবস্থাও সেইখানে স্থির করিয়া ফেলিল।

মেজদাকে অমল বলিল, তাহার মাথার অসুখ হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেইজন্য সে আজ তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু অনিলের অনুরোধে, অনিলের পিসতুত ভাইয়ের খুড়তুত ভগিনীপতি, শ্রীযুক্ত...এম-ডি মহা-শয়ের নিকট গিয়া বিনা ভিজিটে ব্যবস্থা লইয়া আসিয়াছে যে, পড়াশুনার ভিড় কমাইয়া দিনকতক নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা তাহার পক্ষে সত্ত্ব আবশ্যক, এবং উক্ত অনিলের সাগ্রহ অনুনয়ে বাধ্য হইয়া সেও মত দিয়া ফেলিয়াছে যে, অনিলদের শালিখার বাগানবাটীতে সে একমাস গিয়া বাস করিবে। অবশ্য অনিলও তাহার সঙ্গে থাকিবে এবং তাহার কষ্ট হইতে দিবে না। অতএব, তাহাকে যাইতে হইবে।

মেজদা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, এবং উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া তখনই তাহাকে সঙ্গে লইয়া অন্যান্য নামজাদা ডাক্তার কবিরাজের মতামত জানিতে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু অমল নিষ্ফল পরিশ্রম বলিয়া

অনেক তর্কযুক্তি দেখাইয়া সে বিষয়ে তাঁহাকে নিরস্ত করিল। তার পর প্রফুল্ল মনে অভীপ্সিত কার্য্যে বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার সময় বিদেশবাসী পিতামাতার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি-ভালবাসা হেতু মেজদাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া গেল যে মেজদা যেন অমলের শিরঃপীড়া ও বিশুদ্ধ বায়ুসেবনের সংবাদটা তাঁহাদের না জানান। কারণ তাঁহারা দুশ্চিন্তায় পড়িবেন। মেজদা স্বীকৃত হইলেন।

দিন পনেরো কাটিয়া গেল। অমল সেই মেসের নির্জ্জন ত্রিতলের কক্ষে খিল আঁটিয়া দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গান দাঁড়া আয়নার সম্মুখে, খোলা জানালার পাশে দাঁড়াইয়া মনের সাধে লম্ফ ঝাড়িয়া, যোগ্যোযোগ্য ভাব-ভঙ্গিমা বিন্যাসে, অভিনয় কৌশল অভ্যাস করিতে লাগিল। ষ্টেজ ম্যানেজার অনিলবাবু পাকা ওস্তাদ, তিনি মাঝে মাঝে আসিয়া তালিম দিয়া যাইতেন। কি ছিনু কি হনু—ভাবিয়া অমলের স্ফূর্ত্তির সীমা রহিল না। থিয়েটার উপলক্ষে কলেজে হপ্তায় যে কয়দিন ছুটি ধার্য্য হইয়াছিল, অমল তাহার উপর আরও দুইদিন বাড়াইয়া লইল।

মেসে যে কয়জন ভদ্রলোক বাস করিতেন, তাঁহারা সকলেই আফিস কাছারির বাবু। দশটা পাঁচটা পর্য্যন্ত তাঁহারা মেস ছাড়া থাকিতেন, অমল সেই সময়টা যতটা পারিত ততটা চীৎকার করিয়া লইত, তারপর তাহাকে কণ্ঠস্বর সংযত করিতে হইত। মেসের বাবুরা জানিতেন অমল বি-এ এগ্‌জামিনের পড়া তৈয়ারী করিবার জন্য ত্রিতলের নির্জ্জন কক্ষ ভাড়া লইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা কেহ বড় একটা তাহার দিক ঘেঁসিতেন না। কচিৎ কেহ কৌতূহল-বশবর্ত্তী হইয়া, আলাপ করিতে অগ্রসর হইলে অমল তৎক্ষণাৎ নিরীহ ভদ্রলোক সাজিয়া, নিতান্ত উদাসীনভাবে 'আসুন' 'বসুন' বলিয়াই—একান্ত মনোযোগের সহিত ওয়ার্ডসওয়ার্থ খুলিয়া বসিত। আলাপ-উৎসুক ব্যক্তি অগত্যা রণে ভঙ্গ দিতেন, এবং অমলও

সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অকস্মাদ্দৃষ্ট পিতৃ-প্রেতাত্মা অপ্রত্যাশিতভাবে মাতার কলঙ্ক কাহিনী ব্যক্ত করিয়া তিরোহিত হইলে হরিরাজের হৃদয়ের ভীষণ অবস্থা স্মরণ করিয়া, মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয় বুকের কাছে উঠাইয়া রুদ্ধ বেদনাতঙ্ক বিস্ফারিত নয়নে বক্তৃতা সুরু করিত,—

ধীরে বহ, শোণিত প্রবাহ...ইত্যাদি।

সেদিন দুপুর বেলা আহারাদির পর পাণ চিবাইতে চিবাইতে অমল নিশ্চিন্ত আরামে ইচ্ছামত ভাবে নাটকের স্থানে স্থানে আবৃত্তি করিতেছিল। ক্রমশঃ রোখ চড়িল, কণ্ঠস্বর উচ্চে উঠিল, হস্ত পদও বিবিধ কৌশলে আস্ফালিত হইতে লাগিল। তারপর উত্তেজনায় রক্তমুখে অমল ওরফে হরিরাজ আরম্ভ করিল,—

মাতা,—নিষ্ঠুরতা অধিক কাহার?
নহে তঃ আমার, ভাব একবার
নিজ ব্যবহার, আমার পিতার প্রতি—

ফুস্‌ফুসের সমস্ত শক্তি কণ্ঠস্বরে চড়াইয়া, উৎকট আবেগভরে—"পিতার প্রতি" কথাটা বলিতে বলিতে কাল্পনিক হরিরাজ, সজোরে উর্দ্ধে হস্তোৎক্ষেপ করিয়া যেমন স্বর্গীয় পিতার আবাসস্থল নির্দ্দেশ করিতে যাইবে, অমনি সহসা রাস্তার ও পাশের বাড়ীর খোলা জানলার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল,—মুহূর্ত্তেই সে হতভম্ব হইয়া গেল! দেখিল, বিছানা-ঝাড়া ঝাড়নের রঙীন বাঁট ক্ষুদ্র সুন্দর হস্তে মুঠাইয়া ধরিয়া, তাহার উপর চিবুক রাখিয়া, আগ্রীবচুম্বিত কুঞ্চিতালকবিশিষ্ট একখানি অতি চমৎকার কচি-কোমল মুখ, স্নিগ্ধ কৌতুক হাস্যমণ্ডিত অধরে জানালার পাশ হইতে উঁকি মারিয়া কৌতূহল ব্যগ্র নয়নে তাহার অভিনয় লীলা দেখিতেছে!

অমলের স্তম্ভিত দৃষ্টি বিদ্যুৎ চমকে ধাঁধিয়া ক্ষণমধ্যে সেই সুন্দর

মুখখানি অন্তরালে অন্তর্হিত হইল। পরক্ষণেই উৎসাহ-আবেগ-প্রমত্ত অমলচন্দ্রের হৃদয়-মনেও—শোচনীয় অবস্থান্তর ঘটিল!

বলা বাহুল্য, তারপর সারাদিনটা অমলের না-হইল পড়াশুনা, না হইল অভিনয় অভ্যাস,—না হইল আর কিছু। সে 'চমকিত মন চকিত শ্রবণ তৃষিত-আকুল আঁখি'তে সেই জানালার উপর সতর্কভাবে প্রহরা দিয়া সমস্ত সময়টি কাটাইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অভিলষিত বস্তুর দর্শন আর মিলিল না!—হতাশ ব্যাকুলতায় অমলের হৃদয় আলোড়িত হইয়া ক্রমাগত সঙ্গীতচ্ছন্দে সকরুণ বেদনা বিলাপ ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল—

"আর তঃ আসিল না, আর তঃ হাসিল না,
আর তঃ দিলনা সে ফিরিয়া দেখা গো!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একদিন, দুইদিন, তিনদিন কাটিয়া গেল। অমল প্রত্যহ সকালে বিকালে দ্বিপ্রহরে, সযত্নে বেশবিন্যাস করিয়া, মাথার চুলগুলা নানাধাঁচে উল্টাইয়া টেরি ফিরাইয়া, মুখের উপর বারবার সযত্নে তোয়ালে ঘষিয়া, চোখের চশমা যোড়া যথাসাধ্য জোরে রুমালে মাজিয়া, পঁচিশ বার চক্ষু হইতে খোলা-পরা করিয়া উন্মনা চিন্তাকুল বদনে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিয়া বেড়াইল। কখনও বা প্রাণপণে ধৈর্য্য ধরিয়া সযত্নে গলা শানাইয়া নেপথ্যান্তরালবর্ত্তিনীর মনোযোগ আকর্ষণের অভিপ্রায়ে গুরুগম্ভীর নিনাদে "হরিরাজে"র হৃদয়দ্রাবী বাছা বাছা অংশগুলা 'এক্ট' করিল, এবং প্রতিমুহূর্ত্তে পরম ঔদাস্যের ভানে সতর্ক বক্র-কটাক্ষে জানালার পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু হায়রে দুরাশা!—'কেহ নাই, কিছু নাই

গো!' নিদারুণ পরিতাপের নিশ্বাস ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে নীলাকাশের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া অধীর বেদনায় 'হরিরাজ' ওরফে অমল শেষে ক্ষুব্ধ আক্ষেপ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল :—

"বিশ্বাস? কাহাকে বিশ্বাস?
মানব হৃদয়?—
বিশ্বাসের উপযুক্ত স্থান সে ত নয়—

কিন্তু অমলের উৎসাহিত কণ্ঠস্বর নৈরাশ্য দুঃখ পীড়নে শীঘ্রই ক্ষীণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে এবং বিয়োগান্ত নাটকের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতারাশি—হাস্যোদ্দীপক প্রহসনের ব্যঙ্গবর্ষী সুরে প্রতিধ্বনিত হইয়া যথার্থই করুণ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আভ্যন্তরিক দৌর্ব্বল্য-বিকলতায় প্রণয়-ব্যাধি-আক্রান্ত প্রেমিক-জনোচিত নির্জ্জীবতা অনুভব করিয়া অমলচন্দ্র অচিরাৎ শয্যাশ্রয় গ্রহণ ও নিদ্রাকর্ষণে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, এবং কিছুক্ষণের জন্য বাসার ঠাকুর ও চাকরগুলির কাণ জুড়াইয়াছে।

কিন্তু দৈবের মুখাপেক্ষায় বাতায়নের আশায় বসিয়া থাকিয়া লাভ নাই দেখিয়া উদ্যোগী পুরুষসিংহ অমলচন্দ্র অবশেষে লক্ষ্মীলাভের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। সন্ধান লইয়া জানিল—উক্ত ত্রিতলবাড়ী খানির মালিক কলিকাতার কোন সুবিখ্যাত ব্যবসাদার ব্যক্তি; এবং সম্প্রতি উহা ভাড়া লইয়াছেন, কোন বিদেশাগত বাঙ্গালী ভদ্রলোক। অমল দুই চারিজনের কাছে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভদ্রলোকটির নাম জানিতে পারিল না। অগত্যা কি সুযোগে উক্ত অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির পরিবারস্থ সেই ব্যক্তি-বিশেষের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিল।

অমলের ঘরের অন্য দিকের জানালা দিয়া ঐ বাড়ীখানার দ্বারসম্মুখস্থ ফুটপাথের কিয়দংশ দেখা যাইত, অমল প্রথম প্রথম সেইখান হইতে

নজর রাখিল, কিন্তু চাকর বাকরদের গমনাগমন ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

পরদিন অমল বাসার ঘর ছাড়িয়া, সেই ফুটপাথের উপর দিয়া পায়চারি করিয়া প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিল। তারপরে নানা অছিলায় বারবার বাড়ীখানার এ পাশে ও পাশে ঘুরিল। দ্বিপ্রহরের সময় দেখিল বাড়ী হইতে বাহির হইয়া জনৈক গৌরবর্ণ বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভাড়াটিয়া গাড়ীতে চড়িয়া কোথায় প্রস্থান করিলেন। তৃতীয় প্রহরে দেখিল আশপাশের বাড়ীর উড়িয়া চাকর ও বামুনগুলি সেই বাড়ীর সদরের ঘরে সম্মিলিত হইয়া নিশ্চিন্ত আরামে পাণ দোক্তা চিবাইয়া 'ড়' বহুল জাতীয় ভাষায় খোসগল্প করিতে করিতে সুখ স্বচ্ছন্দ মনে অবসর উপভোগ করিতেছে। অমল তৃতীয় প্রহরের রৌদ্রে পথে পথে চক্র দিয়া চতুর্থ প্রহরের অবসানে, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে বাসায় ফিরিল।

নিষ্ফল পথপর্য্যটন ক্লান্তিতে দেহের সহিত মনটাও কেমন নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। অমল চা খাইয়া সন্ধ্যার প্রদীপ নিবাইয়া অন্ধকার কক্ষে, খোলা জানালার কাছে মাদুর বিছাইয়া সামনের বাড়ীর সেই জানালার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। সে জানালাটা তখন বন্ধ ছিল, তবে খড়খড়ির ফাঁক দিয়া গৃহমধ্যস্থ ক্ষীণ আলোকরশ্মি বেশ দেখা যাইতেছিল।

অমল ভাবিতে লাগিল, সে দিনের সেই অভিনয় দক্ষতাটকু অপরিচিতার দৃষ্টিতে কতখানি বিস্ময় ও কি পরিমাণ মুগ্ধতা জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহার সঠিক সংবাদটুকু কাহার কাছে জানিতে পারা যায়? আহা, সেদিন যদি ত্রিশ সেকেণ্ড আগে সে জানিতে পারিত যে তাহার রিহার্শেল-নৈপুণ্য আর একজন গোপনে থাকিয়া চুরি করিয়া দেখিয়া লইতেছে, তাহা হইলে অমলের পক্ষে কি চমৎকার সুযোগই ঘটিত। নিজের দিব্য-

দৃষ্টি-হীনতার জন্য অমল ভাগ্য-দেবতাকে গালি দিয়া সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল !

সহসা ত্রিতলের সেই সম্মুখের জানালাটা কে খুলিয়া দিয়া গেল। চিন্তামগ্ন অমল চমকিয়া চাহিল, কিন্তু প্রস্থিত ব্যক্তিকে আর দেখিতে পাইল না। দেখিল শুধু সেই কক্ষভিত্তিগাত্রে উজ্জ্বল আলোকজ্যোতিঃ প্রতিভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্ষণেক পরে কক্ষমধ্য হইতে সুমিষ্ট কণ্ঠের সঙ্গীত আরম্ভ হইল। অমল লাফাইয়া উঠিয়া নিজের অন্ধকার জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া, রুদ্ধ উত্তেজনায় দ্রুত-স্পন্দিত বক্ষে কাণ পাতিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শুনিল ঠাকুর-কবির সুবিখ্যাত 'সোনার তরী' কবিতায় সুর বসাইয়া, হার্ম্মোনিয়মের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া অতি মনোরম সুললিত তানে গান গাহিতেছে—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা,
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা !

সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে তালে তালে, অমলের হৃদয় মন সদ্য এক অস্বাভাবিক মাতলামির নেশায় মাতিয়া শূন্য লইতে শূন্য স্তরে, দিগন্তে—দূরে, অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে উধাও হইয়া গেল ! সে সমস্ত মনস্তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাব বিশ্লেষণের ধৃষ্টতা প্রকাশে আমাদের সাহস নাই, তবে মোটের মাথায় ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে প্রস্তুত আছি যে গানের উপসংহারে যখন শুনিতে পাওয়া গেল—

"শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি,
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।—"

তখন অমল সত্য সত্যই বদ্ধ পাগল হইয়া পড়িয়াছে।

বিহ্বল ভাবে সে জানালার নীচে বসিয়া পড়িল। কতক্ষণ সেখানে সেই অবস্থায় ছিল স্মরণ নাই, অনেক রাত্রে সংজ্ঞা হইলে চাহিয়া দেখিল,—সঙ্গীত-মুখরিত কক্ষ নীরব হইয়াছে, বাতায়ন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঈষদুন্মুক্ত খড়খড়ির ফাঁক হইতে দেখা যাইতেছে—গৃহমধ্যস্থ আলোকটা বাতায়ন প্রান্তে সরাইয়া আনিয়া, কে একজন হেঁট হইয়া বসিয়া বই পড়িতেছে। তাহার মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না, শুধু কপাল হইতে চক্ষুর নিম্নার্দ্ধ পর্য্যন্ত কিয়দংশ স্থান দেখা যাইতেছে। বিহ্বল বিস্ফারিত কটাক্ষে চাহিয়া অমল চিনিল, সেদিনের সেই বিদ্যুচ্চমকতুল্য ক্ষণিকদৃষ্টা,—সেই, সে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রভাতের আলো এবং হাওয়ায় মগজ ও মন অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হইলে অমল বুদ্ধি শানাইয়া একটা প্ল্যান ঠিক করিতে বসিল। সকল কাযেই তাহার জেদের জোরটা চিরদিন বেশী রকমে প্রকাশ পায়,—এ ক্ষেত্রেও তাহার ত্রুটি হইল না। যে সঙ্কল্পে অন্যকে প্রবৃদ্ধ দেখিলে নৈতিক নিষ্ঠাচারী অমলচন্দ্র সমাজহিতের দোহাই দিয়া নিজের পায়ের জুতা খুলিয়া তাহার পিঠে বসাইতে দ্বিধা করিত না, সেই কাযে, নিজের গরজে আজ স্বচ্ছন্দে লোকলজ্জার মাথা খাইয়া, নিজেই অগ্রসর হইল!

গতকল্য বাসার উড়িয়া চাকরটাকে, ঐ বাড়ীর চাকরদের কাছে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। সুতরাং তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া সুকৌশলে গাম্ভীর্য্য বাঁচাইয়া নানারূপ সওয়াল জবাবে জানিয়া লইল যে, পুরুষ মানুষের মধ্যে উক্ত বাসায় একজন বুড়াবাবু ছাড়া আর কেহ নাই,

এবং বাবুটীও গতকল্য কোথায় গিয়াছেন। চাকরদের নিকট সে শুনিয়াছে—বাবুর ফিরিয়া আসিতে দু' পাঁচদিন বিলম্ব হইবে। অন্দরের খবর সে বলিতে পারিল না।

সুযোগ জিনিষটা একবার অবহেলায় হারাইলে সমস্ত জীবনটাই তাহার জন্য অনুতাপ করিতে হয়,—অভিজ্ঞগণের এই উক্তিটি প্রবলভাবে অমলের মনে পড়িল, সুতরাং এই সুযোগকে সযত্নে বরণ করিয়া লইবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইল।

অমল অনেকক্ষণ ধরিয়া বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া লইল। অভীপ্সিত সঙ্কল্পের প্রতিকূল তর্ক ও অনুকূল যুক্তিগুলা খুব মাজিয়া ঘষিয়া, বাঞ্ছাসিদ্ধির সুনিশ্চিত সম্ভাবনাটুকু যখন মনের মধ্যে প্রখর ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল, তখন নিজের সাইকেলটা বাহির করিয়া একছুটে বাজার হইতে একখানি বই কিনিয়া আনিল। বইখানি জনৈক আধুনিক কবি লিখিত কবিতার বই,—নাম "হৃদয়োচ্ছ্বাস।"

দোয়াতের কালি ও কলমের নিব বদ্‌লাইয়া অমল বইখানির পাতা খুলিয়া কভারের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সযত্নে নিজের নামটী লিখিল। তারপর অন্য একটুকরা কাগজ লইয়া লাল কালিতে লিখিল,

প্রিয় বিদ্যুৎ

আমার হৃদয়োচ্ছ্বাস পাঠাইতেছি। পড়িয়া কেমন লাগে জানাইও। আর কি কি বই পড়িবে লিখিও পরে পাঠাইব। ইতি—

তোমার

অমল

পত্রের উপসংহারে দুঃসাহসী অমলের হাত কাঁপিয়া উঠিল। পাছে এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় এই কয় ঘণ্টার পরিশ্রমলব্ধ প্ল্যানটা মাটী হইয়া যায়, তাই তাড়াতাড়ি চোখকাণ বুজিয়া আত্মদমন করিয়া কাগজখানা

বইয়ের ভিতর রাখিয়া অমল তারস্বরে ভৃত্যকে ডাক দিয়া, নিজে Psychologyর নোটের খাতা খুলিয়া বসিল। ভৃত্য আসিল। নোট লিখনোদ্যত অমলচন্দ্র ষ্টাইলো পেনের মাথায় চিবুক ঠেকাইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসিয়া, একাগ্র মনোযোগে নোটের খাতা দেখিতে দেখিতে, বাম হস্তে 'হৃদয়োচ্ছ্বাস' খানা সরাইয়া দিয়া বলিল, "সামনে ঐ তেতালা-বাড়ীতে বইখানা দিয়ে আয়।"

ভৃত্য সম্মুখস্থ জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঈ, বাড়ী? সে—কোন বাবুমানে দিব?"

মুস্কিলে পড়িয়া অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত ক্ষিপ্রহস্তে নোট টুকিতে সুরু করিয়া, অমল আধ-কাসির ধমকে থামিয়া থামিয়া বলিল—"তিনি বাড়ীর ভেতর আছেন, তুই দিয়ে আয় না—"

দোক্তাখোর উড়িয়া পুঙ্গব, অমলের কৌশলী বুদ্ধিকে 'থ' বানাইয়া, নিজের হুঁসিয়ারী বুদ্ধিটা সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞানে শানাইয়া পুনশ্চ বলিল, "সে—বিহারা যদি বলে, বাবুমানে বাড়ী নাই,—তা হলি ফিরাই কিড়ি আনিব?"

অত্যন্ত বিরক্তির সহিত ধমক দিয়া অমল বলিল, "না না, ফিরাই কিড়ি আনিতে হবে না। তুই বাড়ীর ভেতর পৌঁছে দিয়ে আসবি, তার পর তিনি যখন হোক পাবেন-ই।"

ভৃত্য দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া, ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

অমল সাইকলজির নোট ফেলিয়া, জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া, তীব্র উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে উৎকণ্ঠিত নয়নে ও-বাড়ীর জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। জানালায় দেখিবার মত কিছু তখন ছিল না। অল্পক্ষণ পরে অমল দেখিল, ভৃত্য ওবাড়ী হইতে রিক্তহস্তে বাহির হইয়া আসিল। অমল বুঝিল বইখানা যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে।

ভৃত্যের প্রতীক্ষায় অমল শশব্যস্ত হইয়া আবার নোট টুকিতে বসিল। কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, ভৃত্য তাহার কাছে আসিল না। অন্য দিকের জানালায় আসিয়া অমল উঁকি মারিয়া দেখিল ভৃত্য আসিয়া তাহাদের কলতলায় বসিয়া বাসন মাজিতেছে।

তৎক্ষণাৎ অমল সাবান তোয়ালে লইয়া দুড়্ দুড়্ শব্দে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া কলতলায় আসিয়া হাজির হইল। যদিও অনতিকাল পূর্ব্বে তাহার স্নানাহার সমাপ্ত হইয়াছে, তথাপি বেলা ২টার সময় আবার আজ তাহাকে স্নান করিতে হইবে।

কলতলায় আসিয়া চকিতনেত্রে এদিক ওদিক চাহিয়া অমল নিম্নস্বরে বলিল—"কি রে, বই দিয়ে এলি? কাকে দিলি?"

ভৃত্য বলিল, "সে—বেহারা ভাত খাঁইবারে বসি থিলা, উপর হইতে ছোট দিদিমণি তেকারে চিঠি ফেলিতে দিবাকে আইথিলা, বহি ঠ তেনাকে দিইলা।"

তীক্ষ্ণ কটাক্ষে চাহিয়া অমল ত্রস্তভাবে বলিল, "কোন দিদিমণি? কত বড় বল দেখি?"

ভৃত্য মনে করিল কোন অপোগণ্ড ছোট বালিকার হাতে বইখানা দিয়া আসার জন্য প্রভু বুঝি তাঁহার পুস্তকখানির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন—সুতরাং তৎক্ষণাৎ নিজের কাণ্ডজ্ঞানের প্রমাণ দাখিল করিল। একমুখ হাসিয়া পরম আশ্বাসের স্বরে বলিল, "ছোট নহে, অনেকো বড়!—মোর ছাতিপর হইম্ পারা"--ছাই মাখা হাতখানা নিজের বুকের কাছে উঁচু করিয়া ধরিয়া, ভৃত্য উক্ত 'অনেকো বড়' দিদিমণির দৈর্ঘ্যের জরিপী নিদর্শন দেখাইল।

অমল নিঃসন্দেহ হইল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হাঁ করিয়া ভৃত্যের পানে চাহিয়া রহিল। বলা বাহুল্য সেই মুহূর্ত্তে ভৃত্যের ভাগ্যের সহিত

নিজের ভাগ্যটা বদল করিয়া লইতে পারিলে, সে নিজের জীবন ধন্য জ্ঞান করিত।

ইচ্ছাসত্ত্বেও ভৃত্যকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে অমলের সাহস হইল না। ভৃত্য নিজের কায করিয়া কলতলা হইতে সরিয়া গেল, অমলও অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে স্নান সমাপ্ত করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

পাশের বাড়ীর সেই জানালার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই এবার অমলের মন উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল। দেখিল, জানালার খড়খড়ি ঈষৎ ফাঁক করিয়া, অতি সন্তর্পণে, আপনাকে অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করিয়া, কে একজন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে!—মুহূর্ত্তে অমলের লেশমাত্র দ্বিধা রহিল না যে দর্শনীয় বস্তুটি সে নিজে, এবং পর্য্যবেক্ষণকারিণী সেই—সে!

অমল জামার আস্তিনের বোতাম বারবার খুলিতে পরিতে মনোযোগী হইয়া জানালার দিকে আড়চোখে মাঝে মাঝে চাহিতে চাহিতে, খুব গম্ভীর চালে কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল। কিন্তু দেখা গেল, অল্পক্ষণ পরেই খড়খড়ির ফাঁক নিঃশব্দে বুজিয়া গেল। কক্ষমধ্যে জন-প্রাণীর সাড়া পাওয়া গেল না।

সমস্ত দিন অধীর প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল। কিন্তু 'প্রিয় বিদ্যুৎ' সম্বোধিত মনুষ্যটির তরফ হইতে কেহ আসিয়া—অমলের প্রেরিত 'হৃদয়োচ্ছ্বাসের' ভাল লাগা মন্দ লাগার সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানাইল না বা সরল ভদ্রতার সহিত অমলের ভৃত্যের ভ্রমসংশোধন করিয়া বই ফেরত দিয়া গেল না।

পরদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অমল অপেক্ষা করিল। কিন্তু তথাপি কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। অগত্যা পূর্ব্ব-স্থিরীকৃত

কার্য্যপ্রণালীতে নূতন চাল চালিয়া ভৃত্যকে নিজের ঘরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চিন্তামণি, কাল কোন বাড়ীতে বই দিয়ে এসেছিলি?"

ভৃত্য জানালার ভিতর দিয়া সম্মুখের বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ বাড়ী, যিহানে আপনি বলি থিলা—"

ভালমানুষ অমল অত্যন্ত বিস্ময়ের ভানে চমকিয়া বলিল, "অ্যাঁ—ও বাড়ীতে কিরে?—আমি কি ও বাড়ীতে দিতে বলেছি?"

ভৃত্য আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "হঁা বাবু তাইত।"

অমল সজোরে টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল—"কখন নয়!"

ভৃত্য হতভম্ব হইয়া বলিল—"তবে?—সে আপনি ত ঐ বাড়ী বরাবর আঙ্গুলো দেখাই থিলা, না?"

অমল আশ্চর্য্য ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "দূর ব্যাটা উজবুক! আমার বলে 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল'—সাইকলজির নোট নিয়ে আমি তখন ব্রহ্মাণ্ড আঁধার দেখছি, সে সময় কোনদিকে আঙ্গুল দেখিয়েছি না দেখিয়েছি, অত কি আমার খেয়াল ছিল? তোর হুঁস-পবন জ্ঞান নেই, ও বাড়ীতে আমি কাউকে চিনি যে তাকে বই পাঠাব?—ওটা কার বাড়ী?"

ভৃত্য মুখ কাঁচু মাচু করিয়া বলিল—"সে—পশ্চিম থে একো বঙ্গাড়ি বাবু আইকিড়ি, কন্যায়ো বিয়া দিবাকে ভাড়া—"

বাধা দিয়া অমল বলিল—"কন্যার বিয়ে দিতে বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন? ওঁরা কি জাত? বামুন বৈদ্য না কায়স্থ?"

ভৃত্য কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—"সে—না জানে,—"

মুখ বিকৃত করিয়া অমল বলিল, "ইউ আর এ ডাঙ্কি!—যা ব্যাটা যা হবার হয়েছে, এখন বইখানা চেয়ে নিয়ে আয় দেখি,—ছ্যা ছ্যা

তোদের জন্য ভদ্রলোকের কাছে মান সম্ভ্রম থাকবে না। দাঁড়া, ভদ্রতা করে ক্ষমা চেয়ে একখানা চিঠি লিখে দিই।"

একখানা চিঠির কাগজ লইয়া অমল লিখিল—

বিনয় সম্ভাষণ মেতৎ—

বন্ধুর উদ্দেশ্যে প্রেরিত একখানি বই আমার ভৃত্য ভুলক্রমে আপনাদের বাড়ীতে দিয়া আসিয়াছে, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমি লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিছু মনে করিবেন না, অপরিচিতের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া বইখানি ফেরত দিবেন। ইতি—

বিনীত,

শ্রীঅমলচন্দ্র বসু।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চিঠি লইয়া ভৃত্য চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া অমলের হাতে একখানি বহি দিল। বহিখানির চেহারা ও নাম দেখিয়া অমল এবার সত্য সত্যই আশ্চর্য্য হইল! দেখিল সেখানি আধুনিক কবির লেখা "হৃদয়োচ্ছ্বাস" নহে, সেখানি বহু প্রাচীন কালের সংহিতাকার প্রণীত বিখ্যাত অনুশাসন তন্ত্র—বর্ত্তমানে বঙ্গবাসী অফিস হইতে প্রকাশিত "কল্লুকভট্ট কৃত টীকয়া, বঙ্গানুবাদেন চ সমেতা"—মনুসংহিতা।

ভৃত্যকে প্রশ্ন করিয়া জানিল যে, সে বেহারার মারফৎ চিঠিখানি বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছিল, বেহারা ফিরিয়া আসিয়া ঐ বহিখানি তাহার হাতে দিয়া বলে, "দিদিমণি দিয়াছেন।"

অতঃপর কি করা উচিত মন দিয়া ভাবিয়া লইবার জন্য অমল

তাড়াতাড়ি ভৃত্যকে বিদায় দিয়া, ক্যাম্বিশের চেয়ারের উপর আড় হইয়া পড়িয়া, গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে এই যে অদ্ভুত উত্তরটি আসিয়া পৌঁছিল, —ইহার অর্থ কি? ইহাও কি সত্য সত্য ভ্রমবশতঃ অনবধানতা? না পরিহাস মাত্র?

দিদিমণি নামধারিণী যিনি ইহা পাঠাইয়াছেন, অনুমানে তাঁহার পরিচয়টা ত বেশই বুঝিতে পারা যাইতেছে। তিনি সুন্দর গাহিতে বাজাইতে জানেন, এবং সেদিন রাত্রে বই লইয়া, আলোর সম্মুখে তাঁহাকে পড়িতেও দেখা গিয়াছে। অতএব আধুনিক কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস ও প্রাচীন শাস্ত্রকারের সংহিতার পার্থক্য যে তিনি বোঝেন না,—ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়!

হঠাৎ অমলের মনে হইল, ইহাও একটা চাল!—অমল যেমন চাতুরি খেলিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক ভ্রম করিয়া পরে ক্ষমা চাহিবার সুযোগ করিয়া লইয়াছে, প্রতিপক্ষও হয়ত তেমনি কোন প্ল্যান খাটাইয়া বুদ্ধির নৈপুণ্য প্রকাশের একটা অবসর যোগাড় করিবার উদ্দেশ্যে, এই মনুসংহিতা খানা পাঠাইয়াছেন।

অমল উৎসাহিত চিত্তে বই খুলিয়া, পাতা উল্টাইতে লাগিল। দেখিল —কভারের তৃতীয় পৃষ্ঠায় সুন্দর মেয়েলি অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "কল্যাণীয়াসু, কুমারী ক্ষণপ্রভা মিত্রের করকমলে,—স্নেহ-উপহার।— ইতি দিদি।"

আবেগস্পন্দিত হৃদয়ে দ্রুত কম্পিত হস্তে অমল পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত খস্ খস্ করিয়া উল্টাইয়া দেখিল—যদি কোথাও আর কাহারও কোন হস্তাক্ষর বা মন্তব্য থাকে। কিন্তু না,—আর কোনখানেই কিছু নাই।

অমল একবার ভাবিল পুনর্ব্বার ক্ষমা চাহিয়াই বইখানা ফেরত দেয়। আবার ভাবিল, 'না থাক, দেখা যাক কতদূর কি হয়।'

দুই দিন কলেজ খোলা ছিল, অমল কামাই করিয়াছে, আজও কলেজ খোলা আছে, আজ একবার যাইতে হইবেই। অমল চিন্তা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সাইকেল লইয়া বাহির হইল।

কোন রকমে কলেজের সময়টা কাটাইয়া, ছুটির পর কলেজের বাহিরে আসিয়া অমল সিরিঞ্জ খুলিয়া সাইকেল টায়ারে পম্প করিয়া লইতেছে, এমন সময় এক গাড়ী করিয়া মেজদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া, স্বভাব-সিদ্ধ স্নিগ্ধগম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "অমু, তোকে ধরবার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি আস্‌ছি। কাল পরশু এসে ফিরে গেছি। পরশু সন্ধ্যাবেলায় অনিলবাবুদের শাল্‌থের বাগানে কত খোঁজ করে গিয়ে, তোর সন্ধান নিলুম, মালী বল্লে এখানে কেউ নেই—"

শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া, প্রাণপণে আত্মদমন করিয়া অমল বলিল, "পরশু সন্ধ্যায়?—ওঃ, তা সে সময় ত আমরা কেউ ছিলুম না, লজিকের প্রফেসারের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছলুম, তিনি আমাদের থিয়েটারের—"

মেজদা বলিলেন, "বাজে কথা থাক, এখন আমার কথাটা শোন। আমার শ্বশুর সপরিবারে লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন, আজ কদিন হল। তিনি কোন কাযের জন্যে হোসেঙ্গাবাদের ঐ দিকে গেছেন, সম্ভবতঃ কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করেও আস্‌বেন। এ দিকে আমার সম্বন্ধী প্রমথবাবু—ঢাকা কলেজে প্রফেসারী করেন, নাম শুনে থাকবি বোধ হয়—তিনিও আজ সস্ত্রীক এখানে এসেছেন। এইমাত্র কলেজে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বল্লেন, অমলবাবু বিয়ে করুন না-করুন, সে তাঁর

নিজের ইচ্ছা,—কিন্তু একবার যদি অনুগ্রহ করে আমার বোনটিকে নিজের চক্ষে দেখেন, তাহলে—বড় ভাল হয়—”

অমলের মগজের মধ্যে তখন মনুসংহিতা ও হৃদয়োচ্ছ্বাসের বিনিময় বিভ্রাটের কারণ নির্ণয়ে, সুন্দ উপসুন্দের লড়াই চলিতেছিল। মেজদার শ্যালকের ভগিনী-দর্শনের প্রস্তাব তাহার মাঝে যেন লৌহ মুদ্গরাঘাতের মত বাজিল। অধীর আক্ষেপে অমলের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সজোরে উত্তর দিল, “না না, আমি আবার নিজের চোখে দেখতে যাব কি ? এখন আমার ওসব সময় নেই। এগ্‌জামিনের দিন ঘুনিয়ে আসছে, আমার রাত্রে ঘুম হয় না। এখন বিয়ে ফিয়ের কথা তোমরা তুলো না মেজদা, আমার মাথা গুলিয়ে যায়।”

গাড়ী হইতে নামিয়া সহাস্য মুখে তাহার কাঁধ চাপড়াইয়া মেজদা বলিলেন, “আহা শোন না, তুই বারণ করিস, এখন আমরা বিবাহটা স্থগিত রাখছি, কিন্তু মেয়ে যদি পছন্দ হয়, তা হলে কথাবার্ত্তা পাকাপাকি করে রাখতে দোষ কি ?”

প্রত্যেক শব্দ পিছু তিন তিন বার ঘাড় নাড়া দিয়া অত্যন্ত উষ্ণ-অসহিষ্ণু ভাবে অমল বলিল, “না না না, ওসব হাঙ্গাম এখন আমার পড়াশুনোর সময় পোষাবে না পোষাবে না—”

গম্ভীর মুখে মেজদা বলিলেন, “সে ত ঠিক কথা। তোমার পড়াশুনোর সময় ও সব হাঙ্গাম পোষান’ই অনুচিত। তবে কি না তাঁদের মেয়েটি বড় হয়েছে, দেশাচার মতে অরক্ষণীয়া অবস্থা বল্‌লেই হয়, কাযেই তাঁরা—

রাগে লাল হইয়া অমল বলিল, “তাঁরা অন্য ব্যবস্থা করতে পারেন। অরক্ষণীয়াকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে দেশে যোগ্য প্রহরীর অভাব নেই। টাকা ফেলুন,—লাঠি ঘাড়ে নিয়ে ঢের লোক তাঁর বোনকে পাহারা দিতে রাজি হবে, আমায় ধর্‌পাকড় করা কেন ? আমার অত সময়ও নেই

সখও নেই,—বলে দিও তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে আমার ভরসা ছেড়ে দেন—”

পাছে মেজদার দ্বিতীয় বাক্য শুনিতে হয় তাই অমল তিন লম্ফে হপিং করিয়া সাইকেলে চড়িয়া, প্রাণপণ শক্তিতে প্যাডেল ঘুরাইয়া, বোঁ বোঁ শব্দে অন্তর্হিত হইল। মেজদার মুখভাবটা কিরূপ হইল তাহাও সে চাহিয়া দেখিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাসায় আসিয়া সাইকেলটা যথাস্থানে রাখিয়া ঘর্ম্মাক্ত জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে হাতের বইগুলা বিছানার উপর ফেলিয়া অমল পাশের বাড়ীর জানালার দিকে চাহিয়া একেবারে ভয়ানক চমকিয়া উঠিল।—দেখিল সেই জানালার গরাদে ডান হাত রাখিয়া, বাম হাতে সদ্যঃ ইস্ত্রী করা ডবল ব্রেষ্ট কামিজের বুকের বোতাম ঘুরাইতে ঘুরাইতে, ধব্‌ধবে সুন্দর চেহারার একজন যুবক, সোনার ফ্রেমমোড়া চশমার ভিতর হইতে দ্রুতচঞ্চল কটাক্ষে উৎসুকভাবে এদিক ওদিক চাহিতেছে, মাঝে মাঝে অবশ্য অমলের জানালার দিকেও দৃষ্টিদান করিতে ছাড়িতেছে না। তাহার গোঁফ দাড়ি কামানো,—মাথায় ঘনকৃষ্ণ চুলেও—সৌখীন না হোক, মোটামুটি ধরণের একটু টেড়ি ফিরান রহিয়াছে। যুবকটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে, আর—কাহারও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য মানুষ যেরূপভাবে গলা খাঁখারি দেয়,—সেইরূপ ভঙ্গিমায় থাকিয়া থাকিয়া মৃদুমন্দ কাসিতেছেন।

কে ঐ ব্যক্তি, কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছে—ভাবিতে গিয়া

অমলের দুই চক্ষু ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল। চাকরের কথা মনে পড়িল, ঐ বাড়ীর বাবু মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য এদেশে আসিয়াছেন।—দেশ, কাল, পাত্রের সংস্থান সমাবেশের সহিত কার্য্য-কারণ সম্পর্ক সংযোগ করিয়া প্রখর বুদ্ধিমান্ অমলচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল—ঐ চশমা পরা লোকই সদ্যঃ ইস্ত্রী করা শার্ট পরিয়া এবাড়ীতে আসিয়াছে—নিশ্চয়ই মেয়ে দেখিতে।—সঙ্গে সঙ্গে অমল সেই সিদ্ধান্তের ভবিষ্যৎ পরিণাম ও মীমাংসা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিল যে, লোকটা অবশ্যই পাত্রীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, আজই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া বিদায় লইবে। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অমলের জামা জুতা ছাড়া, হাত মুখ ধোয়া, বিশ্রাম করা, সব ঘুলাইয়া গেল। অকারণ ক্ষোভ ও অর্থহীন বিদ্বেষে তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। নিজের জানালার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া ভীষণ ভ্রূভঙ্গিপূর্ণ কটাক্ষে সে ঐ লোকটাকে যতদূর সম্ভব ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে চেষ্টা করিল।

কিছুক্ষণ পরে লোকটা সরিয়া গিয়া জানালার সোজাসুজি একটা চেয়ারে বসিয়া গৃহমধ্যস্থ আর এক ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল, মাঝে মাঝে হাসিও চলিতে লাগিল। আর থাকিয়া থাকিয়া লোকটা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে অমলের গৃহের বাতায়ন নিম্নস্থ বহুদিনের অসংস্কৃত অর্দ্ধভগ্ন কার্ণিশের শোভা দেখিতে লাগিল। অমলের ধৈর্য্যচ্যুতির উপক্রম ঘটিল। হঠাৎ ধড়াস্ করিয়া সে নিজের জানালা বন্ধ করিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক সেই অবস্থায় কাটিল। তারপর অমল শুনিল, ও বাড়ীর বেহারা চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিতেছে, "বাবু, গাড়ী আয়া।"

অমল চট করিয়া অন্যদিকের জানালায় সরিয়া আসিয়া দেখিল,—হাঁ রাস্তায় একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু সেখানা মোটরও নহে

ল্যাণ্ডোও নহে, ব্রুহাম ফিটন কিছুই নহে, সামান্য একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী মাত্র !—অমল মনে মনে কতকটা আশ্বস্ত হইল, যাক্ লোকটার অবস্থার পরিচয় কিছু তবু পাওয়া গেল।

দুই মুহূর্ত্ত ভাবিয়া অমল মনে মনে একটা ফন্দী ঠাহরাইল, এবং তৎক্ষণাৎ একখানা চাদর ও ছাতাটা টানিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাসা হইতে বাহির হইয়া, দ্রুতপদে ঐ বাড়ীর সামনে রাস্তায়, যেখানে গাড়ীখানা দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল তখনও গাড়ীতে সওয়ারী কেহ চাপে নাই, কিন্তু গাড়োয়ানটা গাড়ীর চারিদিকের জানালা-গুলা বন্ধ করিয়া দিতেছে। অমল আশ্চর্য্য হইল—মনে মনে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "কর্ত্তা অসূর্য্যম্পশ্যা না কি ?"

কিন্তু রুদ্ধ বাতায়ন গাড়ীতে আরোহীর আরোহণ ব্যাপার দর্শন প্রতীক্ষায় কৌতূহলী দৃষ্টি মেলিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ভদ্রলোকের পক্ষে সমীচীন নহে। অমল ধীরে ধীরে ফুটপাথ অতিক্রম করিয়া পাশের গলির মধ্যে ঢুকিল। নিকটেই একটা পাণের দোকান ছিল, দোকান হইতে এক পয়সার সাজাপান কিনিয়া লইয়া অবিলম্বে আবার ফিরিল।

গলি হইতে বাহির হইয়া, অমল দেখিল, এবার বাড়ীর বেহারাটা গাড়ীর পাদানের কাছে দাঁড়াইয়া গাড়ীর দুয়ার আধ ভেজাইয়া বাড়ীর দ্বারের দিকে চাহিয়া যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছে—অমলের বুঝিতে বাকী রহিল না যে গাড়ীতে কেহ চড়িয়াছে, এবং অতঃপর আরও কেহ চড়িবে।

দ্বারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অমল অন্যদিকের ফুটপাথ ধরিয়া খুব আস্তে আস্তে হাঁটিয়া চলিল। যখন গাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, তখন দেখিল বাড়ীর ভিতর হইতে দুইজন পুরুষ মানুষ বাহির হইয়া আসিতেছে, অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি সেই লোক।

অমল তীব্র কটাক্ষে তাহার পানে চাহিল, কিন্তু পরক্ষণে তাহার সঙ্গীর দিকে নজর পড়িতেই, অত্যন্ত থতমত খাইয়া,—অমল তাড়াতাড়ি মুখের উপর ছাতা মুড়ি দিয়া হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইয়া পড়িল। গাড়ীখানার দিকে ফিরিয়া চাহিতেও তাহার সাহস হইল না,—সে ব্যক্তির সঙ্গী আর কেহ নহে, স্বয়ং মেজদাদা!

উৎকট দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া অমল যখন বাসায় আসিয়া পুনরায় নিজের ঘরের জানালা দিয়া উঁকি মারিল, তখন গাড়ীখানা চলিয়া গিয়াছে।

চেয়ারে বসিয়া, বিছানায় শুইয়া, এবং কক্ষতলে বারম্বার পরিক্রমণ করিয়া, ঝাড়া তিনঘণ্টা ধরিয়া অমল, অনেক ভাবনা ভাবিল, কিন্তু মেজদা যে কোথা হইতে কেমন করিয়া, কি সম্পর্ক ধরিয়া ঐ লোকটার সঙ্গী হইয়া এ বাড়ীতে কেন আসিয়াছিলেন, অমল সে রহস্যের কোনই মীমাংসা করিতে পারিল না।

অমল যখন গুরুতর চিন্তায় একান্ত ব্যতিব্যস্ত, তখন তাহার বন্ধু অনিলবাবু আসিয়া সহাস্য মুখে গুড্ ইভ্নিং জানাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনার এ্যাক্ট সব কম্প্লিট হয়ে গেছে ত? প্রিন্সিপাল মহা চটে গেছেন, বল্লেন থিয়েটারের হুজুকে ছেলেদের ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে,—এ হুজুক শীঘ্র ঠাণ্ডা করা চাই, আসছে রবিবারের পর রবিবার থিয়েটার হবে না, এই রবিবারেই থিয়েটার শেষ করতে হবে, তাই আপনার কাছে ছুটে এলুম, আপনার সব তৈরী হয়ে গেছে ত?—যা বাকী আছে, আজ কালেই তৈরী করে নিন্—"

অমল কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া সবিনয়ে ক্ষমা চাহিয়া সংক্ষেপে বলিল, কতকগুলি পারিবারিক দুর্ঘটনায় তাহার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, এ অবস্থায় হরিরাজের অভিনয় দেখাইয়া, লো-

হাততালি ও বাহবা আদায় করিবার মত ধৈর্য্য বা ক্ষমতা তাহার নাই, অতএব থিয়েটার উদ্যোগিগণ যেন অন্য হরিরাজের সন্ধান করেন ইত্যাদি—

অনিল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এও কি একটা কথা ?"

অমল দৃঢ়স্বরে বলিল, "এই আমার শেষ কথা মশায়। এখন ঠাট্টা তামাসার সময় আমার নেই,—আমায় এখনি মেজদার বাসায় যেতে হবে, সেখানে আমার জরুরি কাজ আছে—"

অনিল চিন্তিত হইয়া বলিল, "শুনুন অমলবাবু—"

অমল অধীর হইয়া বলিল, "কিছু শোনবার সময় আমার নেই মশায়, বেশী কেন অনর্থক পীড়াপীড়ি করবেন। আমার চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও থিয়েটারী হুজুকে মাতে নি, আমি মেতে ঠেকেছি, আর নয়,— অনুগ্রহ করে আমার নামটা আপনাদের লিষ্ট থেকে বাদ দেন,—"

বিনয় সম্ভাষণে বন্ধুকে বিদায় দিয়া অমল ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল তখন রাত্রি ন'টা।—কিন্তু উৎকণ্ঠায় তাহার কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিয়াছিল, সে দ্বিধামাত্র না করিয়া সেই রাত্রে সাইকেল লইয়া মেজদার বাসায় ছুটিল।

মেজদার বাসার দ্বারে পৌঁছিয়া দেখিল, বাড়ীর ছেলেরা ও চাকর বাকরগুলি তত রাত্রেও অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছে, উদ্বিগ্ন হইয়া অমল ভজহরি চাকরকে ডাকিয়া বলিল, "ভজু ব্যাপার কি ? বাড়ীর সব ভাল ত ?"

ভজহরি অমলের মুখপানে চাহিয়া, এমনই আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিল, যেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের আগমনও সে সময় ইহা অপেক্ষা বেশী স্বাভাবিক ছিল। মাথা চুলকাইয়া বলিল, "ছোটবাবু এত রাত্রে হঠাৎ যে ?—তা আজ্ঞে হ্যাঁ বাড়ীর সব ভাল—"

অমল বলিল, "মেজদাদা কি উপরে রয়েছেন?—মেজ বৌদি কি সেখানে আছেন?—"

অধিকতর কুণ্ঠিত হইয়া ভজহরি বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মেজ বৌমার ভাই, ভাজ, বোন সবাই সেখানে আছেন—

চমকিয়া অমল বলিল,—"এঁ্যা মেজ বৌদির ভাই বোন?—

ভজহরি বলিল "আজ্ঞে, আজ এখানে যে তাঁদের নিমন্ত্রণ—

সাইকেলের মুখ ঘুরাইয়া প্রস্থানোদ্যত অমল বলিল, "ওঃ, তবে থাক। ত্মাখো ভজু, আমি এখন এসেছিলুম একথা যেন কাউকে বোল না—"

সাইকেলে উঠিয়া, অমল ক্ষণমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

—— —

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কোন রকমে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে উঠিয়াই অমল জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ও বাড়ীর মুক্তদ্বার বাতায়নের ভিতর হইতে গৃহাভ্যন্তরে যে দৃশ্য দেখা গেল, তাহাতে অমলের চক্ষুস্থির হইল। দেখিল, পূর্ব্বদিনের সেই লোকটা জানালার কাছে চেয়ারে বসিয়া চা খাইতে খাইতে, নিশ্চিন্ত আরামে খবরের কাগজ পড়িতেছে!

অমলের হাড় জ্বলিয়া গেল,—কল্পনাবলে সে তৎক্ষণাৎ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল যে, নিশ্চয়ই পূর্ব্বদিনে বিবাহের কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, এবং বাড়ীর লোকের অনুরোধে, সম্ভাবিত আত্মীয়তাটা পূর্ব্বাহ্নেই ঘনিষ্ঠতর করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে, আজ সে প্রাতঃকালেই নির্লজ্জের মত চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছে!—হয়ত অন্যান্য বিষয়ের আরও প্রয়োজন আছে।

কিছুক্ষণ পরে লোকটা উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে ফুটপাথের উপর পায়চারি করিতে লাগিল। এবার তাহার আপাদ-মস্তকের সাজসজ্জার উপর দৃষ্টিপাত করিয়া অমলের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না যে ইহা শুধু নূতন জামাইবাবু সাজা ছাড়া আর কিছু নয়! অমল স্থির নয়নে চাহিয়া চাহিয়া সেই লোকটার পায়ের রেশমি ফুলকাটা মখমলের জুতা, পরণের চুনট করা ফরাশডাঙ্গার জরিপাড় ধূতি এবং গায়ের আধুনিক প্রচলিত 'গ্লাজের' পাঞ্জাবী ও তাহার সূক্ষ্ম আবরণাভ্যন্তর হইতে স্পষ্ট দৃশ্যমান রঙ্গিণ শিল্কের গেঞ্জি যতই দেখিতে লাগিল, ততই তাহার মন বিলাসিতার প্রতিকূলে ঘৃণায় বিষাক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। দরিদ্র বাঙ্গালাদেশের ভদ্রলোক আখ্যাধারী লোক-গুলা সৌখীন সভ্যতার দোহাই দিয়া যে কিরূপ মূঢ়ভাবে, ঐরূপ অসহনীয় বিলাসিতায় অর্থ ও সময়ের অপব্যয় করে, সে সম্বন্ধে অমলের আজ দিব্যদৃষ্টিলাভ হইল। নিজের সাজসজ্জা সম্বন্ধেও অমলের আজ রুচি ফিরিয়া গেল, এবং ঐ লোকটাকেও এ সম্বন্ধে খুব তুড়িয়া দশকথা শুনাইয়া, ভারতের অর্থকষ্ট সম্বন্ধে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করাইবার ইচ্ছা হইল।

অমল দেখিল, লোকটা ফুটপাথের উপর পায়চারি করিতে করিতে বক্র কটাক্ষে ঘন ঘন অমলের অধিকৃত গৃহখানার পানে তাকাইতেছে। অমলের সন্দেহ ক্রমশঃ শঙ্কায় পরিণত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, এ লোকটা ত অমলের সেই 'অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির' অন্তরালে সেই 'ইচ্ছাকৃত বাঁদরামি প্রকাশক' গুপ্ত তথ্য,—অর্থাৎ 'হৃদয়োচ্ছ্বাস' উপঢৌকনের সংবাদটা ত ইতিমধ্যে জানিয়া ফেলে নাই?—অমলের মন অধীর হইয়া উঠিল।

অবশেষে অমলের হৃদয়ে স্থির বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল যে, আর যাহাই

হউক,—কিন্তু লোকটার চাহনি দেখিয়া তাহাকে পূরা শত্রু বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে!—সঙ্গে সঙ্গে অমল ঐ লোকটাকে জব্দ করিবার ফন্দী উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

একবার ভাবিল, সাইকেলটা লইয়া বাহির হইয়া সুকৌশলে ঐ নিশ্চিন্ত ভ্রমণশীল ফুল-বাবুটির ঘাড়ের উপর পড়িয়া উহার একটা হাত কিম্বা পা জখম করিয়া কিছুদিনের মত উহাকে শয্যাশায়ী রাখিবার বন্দোবস্ত করে। আবার ভাবিল, কোন সূত্রে দ্বন্দ্ব কলহ বাধাইয়া ঐ লোকটার সহিত ইউরোপীয় প্রথায় 'ডুয়েল' লড়িবার ব্যবস্থা স্থির করিয়া ফেলে, এবং যদিচ অমল কোন দিন স্বহস্তে পিস্তল স্পর্শ করিবার সুযোগ জীবনে পায় নাই, তথাপি—কোন গতিকে একটা ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রপ্রভাবেই হউক অথবা যেরূপে হউক, রাতারাতি লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত হইয়া অব্যর্থ সন্ধানে পিস্তলের এক গুলিতে লোকটার মাথার খুলি উড়াইয়া দিয়া,—ইহজীবনের মত উহার সুন্দরী বধূ লাভের সথ মিটাইয়া দেয়। আরও কত কি উদ্ভট সঙ্কল্প অমলের মাথায় উদয় হইল, কিন্তু সেগুলার একটাও কাজে লাগাইবার উপযুক্ত বোধ হইল না। কাজেই কাজ কিছু হইল না। লোকটা পুনরায় নিরাপদে বাড়ী ঢুকিল।

দেখিতে দেখিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। হঠাৎ অমলের খেয়াল হইল,—ঐ লোকটার এবং এই বাড়ীর অধিবাসীগুলির সঠিক পরিচয় আজ যেরূপেই হউক মেজদার নিকট হইতে জানিতে হইবে। কাল তাঁহার শালা শালী'র উপদ্রবে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়াছে, আজ জানা চাই-ই।

তখনই সাইকেল লইয়া মেজদার বাসায় পৌঁছিয়া, অমল সটান মেজদার শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইল। মেজদা তখন সামনে টেবিলের উপর আয়না রাখিয়া, চেয়ারে বসিয়া স্বহস্তে ক্ষৌর কার্য্য সম্পাদন করিতে-

ছিলেন। মেজবৌদি ছয়মাসের শিশু খোকাটিকে কোলে লইয়া নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অমল 'মেজদা' বলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই, বিনা ভূমিকায় একেবারে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "কাল বৈকালে তুমি পটলডাঙ্গায় কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়েছিলে ?"

মেজবৌদি ঘোমটা টানিয়া একখানা চেয়ার অমলের দিকে সরাইয়া দিলেন,—'থাক থাক' বলিয়া অমল চেয়ারটায় বসিল। মেজবৌদি অমলের পিছনে দাঁড়াইয়া, হাস্যরঞ্জিত অধরে, গোপনে মেজদাকে কি ইঙ্গিত করিলেন, মেজদা হাতের ক্ষুর নামাইয়া বলিলেন, "হাঁ গেছলুম—"

উৎকণ্ঠিত ভাবে অমল বলিল, "তুমি যখন সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এস, তখন তোমার সঙ্গে একটি বাবু ছিলেন সুন্দর চেহারা,—চোখে চশমা—"

মেজদা চশমা ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে বেশ প্রশংসা ছিল। অমলের চশমা মোড়া চক্ষু দুইটির উদ্বেগ চঞ্চল দৃষ্টির প্রতি স্থির লক্ষ্য স্থাপন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন, "ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রি খাতায় যাদের নাম আছে, তাদের শতকরা নিরেনব্বুই জনের চোখ খারাপ, ও ত জানা কথা। হবে—চোখে চশমা ছিল, তারপর···?"

অধীর হইয়া অমল বলিল, "খুব 'ফব্' গোছের লোক, গায়ে ডবলব্রেষ্ট শার্ট ছিল, একটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে ভাড়াটে গাড়ীতে চড়ে—"

মাথা নাড়িয়া মেজদা বলিলেন, "ওঃ বুঝেছি, হ্যাঁ ছিলেন একটী ভদ্রলোক—"

রুদ্ধশ্বাসে অমল বলিল, "তিনি কে ?"

ঘোমটার ভিতর হইতে উৎসুক দৃষ্টিক্ষেপকারিণী মেজবৌদির দিকে

চকিত কটাক্ষপাত করিয়া মেজদা গম্ভীর মুখে বলিলেন, "তিনি একজন এম-এ, এখন 'ল' পড়ছেন, আমার ক্লাশফ্রেণ্ড ছিলেন, এবার ভায়রা ভাই হবেন। আমার শালীকে কাল 'কনে' দেখ্‌তে গেছলেন।"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অমল বলিল, "তোমার শালীকে ? কনে দেখ্‌তে ? কোথায় ?—"

চামড়ার উপর ক্ষুর শানাইতে শানাইতে পরম ঔদাস্যের সহিত মেজদা বলিলেন, "পটলডাঙ্গার সেই বাড়ীখানা আমার শ্বশুর ভাড়া নিয়েছেন, মেয়ে-ছেলেরা ঐখানেই আছে, ঐখান থেকেই বিয়ে হবে কি না।"

অমলের বাক্‌শক্তি যেন লোপ হইয়া গেল!—দুই মুহূর্ত্ত সে কথা কহিতে পারিল না। তারপর ঢোক গিলিয়া বলিল, "ওঁরই সঙ্গে তোমার শালীর বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল ?"

দাড়ি চাঁচিতে শুরু করিয়া মেজদা বলিলেন, "একবাক্যে! মেয়ে দেখে যেমন পছন্দ হ'ল, অমনি বিয়ের দিন ধার্য্য করে একেবারে উঠলেন। বেশ জুটে গেছে, মেয়েটার জন্যে আমরা বড়ই ভাবনায় পড়েছিলুম, তা ভগবানের ইচ্ছায়—"

বাধা দিয়া সহসা অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে অমল বলিল, "তোমার শ্বশুর যে ঐ বাড়ী ভাড়া নিয়ে সপরিবারে রয়েছেন, তা ত তুমি আমায় একবারও বল নি!—"

মেজদা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কেন, তাতে কি হয়েছে ?—"

কি হইয়াছে, অমল তাহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। অন্ত-র্নিহিত ক্ষোভের নিষ্ফল পরিতাপে, গোঁজ গোঁজ করিতে করিতে সে মেঝের উপর সজোরে জুতা ঘসিতে ঘসিতে হেঁটমুখে বলিল, "আমায় আগে বলা উচিত ছিল সকলের আগে—"

বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া মেজদা বলিলেন, "অবাক্ করলি অমল।

বিয়ের নামে মাথা গুলিয়ে যায় বলে কালও বৈকালে তুই আমাকে ধমক দিয়েছিস্, আবার আজ একি কথা বলছিস্? তোকে পায়ে ধরে সাধ্‌তে বাকী রেখেছিলুম—একটিবার কনে দেখার জন্যে—তুই আমায় মারমুখি হয়ে উঠ্‌লি! এদ্দিন ধরে তোর জন্যে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে তবে না কাল শেষ জবাব পেয়ে অন্য জায়গায় ঠিক করলুম! এখন তুই বলিস্ কি না, তোকে আগে বলা উচিত ছিল!—"

মেজবৌদি যে তাহার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন, সে কথা অমলের মনেই ছিল না। ক্ষোভে অনুতাপে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইতেছিল। রুদ্ধস্বরে সে বলিয়া ফেলিল, "আমি কি জানি যে ঐ—তিনি তোমার শালী!—"

ঠোঁট কাম্‌ড়াইয়া উচ্চহাস্য দমন করিয়া মেজদা ব্যগ্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ঐ—তিনি অর্থাৎ? তা হলে তুই কি আমার শালী ক্ষণপ্রভাকে দেখেছিস্?"

অমলের মুখ লাল হইয়া উঠিল, কাসিতে কাসিতে বলিল, "তোমার শালীকে ক্ষণপ্রভাকে—বাঃ, আমি কেমন করে দেখ্‌ব?—তবে ওঁদের বাড়ীর কাছে মেসে আমার একটি ক্লাশ ফ্রেণ্ড থাকেন, তিনি নাকি—তা সে মরুকগে যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন গতস্য শোচনা নাস্তি—আমার কলেজ যাবার বেলা হ'ল মেজদা, উঠি—"

অমল অত্যন্ত ব্যস্ত চঞ্চল ভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। মেজদা বলিলেন, "শোন শোন অমল, একটা কথা আছে—"

মেজদার 'একটা কথা' শুনিয়া, অমলেরও 'একটা কথা' নূতন করিয়া মনে পড়িল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, হঠাৎ শ্লেষতীব্র স্বরে ঝাঁজের

সহিত অমল বলিল, "আচ্ছা মেজদা, তোমার শ্বশুর বাড়ীর রীতি নীতি সব সাহেবিয়ানা ষ্টাইলের, নয় ?"

সকৌতুক হাস্যে মেজদা বলিলেন, "বেজায় ! বেজায় !—আমার শ্বশুর শাশুড়ীর অবশ্য অপরাধ নেই, তাঁরা সাদাসিধে মানুষ ; কিন্তু ছেলে মেয়ে গুলির কথা বলবার নয়,—আমাদের বাড়ীতেই ত নমুনা দেখ্‌ছ,—" তিনি মেজবৌদির দিকে বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া পুনশ্চ ক্ষুর শানাইতে মনোযোগী হইলেন।

মেজবৌদি বিনা আপত্তিতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। অমল কুণ্ঠিত ভাবে নিম্নস্বরে বলিল, "তাই দেখলুম, চব্বিশঘণ্টা পেরোয় নি, বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে,—এরই মধ্যে তোমার সেই ভায়রা ভাই বাড়ীতে ঢুকে চা খাচ্ছেন, গেটের সামনে দরোয়ানের মত পায়চারি করছেন, আরও কত কি—"

অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাণে মেজদা বলিলেন, "বটে ! তা হবে, কর্ত্তা বাড়ীতে নেই, মা মাসীমার বাড়ীতে ভবানীপুরে গেছেন, আমার সম্বন্ধী 'শূন্য ঘরে ছুণো রাজা' হয়ে ভাবী ভগিনীপতিকে নিয়ে ইচ্ছামত আমোদ আহ্লাদ জুড়ে দিয়েছেন !"

উৎকণ্ঠা ব্যাকুল অমল হৃদয় ভাব প্রচ্ছন্ন করিতে না পারিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল, "তোমার সম্বন্ধীর প্রফেসারি বুদ্ধির খুরে দণ্ডবৎ —হঠাৎ কাল যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—আজ যদি কোন অনিবার্য্য কারণে হঠাৎ তার সঙ্গে বিয়ে না হয়,—"

মেজদা বলিলেন, "তা হলে, ঐ আমোদ আহ্লাদ পর্য্যন্তই, ইতি !"

অমল বলিল, "তারপর ? বোন লক্ষ্মীটিকে আর একজনের ঘাড়ে চাপাতে হবে ত ?"

মেজদা কাঁচি লইয়া গোঁফ ছাঁটিতে সুরু করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়! লক্ষ্মী অবশ্য বাহনশূন্য থাকবেন না—"

মেজবৌদি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং বাঙ্গালায় বলিতে অমলের সাহস হইল না, ইংরেজিতে বলিল, "ইতিমধ্যে লক্ষ্মীর মনোজগতে যদি কোন মারাত্মক বিভ্রাট ঘটে যায়?"

মেজদা উদাসভাবে মস্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তা হ'লে, লক্ষ্মীর নারায়ণটির পক্ষে বিশেষ দুশ্চিন্তার কথা বটে—"

অমল সজোরে বলিল, "ঠাট্টা নয় মেজদা বাস্তবিকই দুশ্চিন্তার কথা!—"

মেজদা বলিলেন, 'কি করব ভাই, নিজের ছাগল কেউ যদি ল্যাজের দিকে কাটে, তাতে হাত কি? ক্ষণু আমার বোন নয়, আমার সম্বন্ধীর বোন, সুতরাং তার ভাইয়ের মূর্খতার জন্য, তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুর্ভাবনায় মাথা ঘামানো, তোমার-আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা!"

অমল আরও জোর দিয়া বলিল, "হোক অনধিকার চর্চ্চা, তা বলে ন্যায্য কথা বলব না? তোমার সম্বন্ধীর কাণ্ডকারখানা, বিলিতি সমাজের বাঁদরামি ভরা কোর্টশিপের চেয়েও সাংঘাতিক।—"

মেজবৌদির মুখপানে বক্র কটাক্ষপাত করিয়া মেজদা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "নিশ্চয় বাস্তবিক আমাদের স্বদেশী সমাজ তন্ত্রমতে—এই যে একেবারে ছাদ্‌নাতলায় দাঁড় করিয়ে সাতপাকের কড়াক্কড় বাঁধনে বেঁধে শুভদৃষ্টির ব্যবস্থা—ওটা খুব ভাল, একেবারে নাকে নাতাড় পরিয়ে ঘাড়ে জোয়াল চড়ান আর কি! ওর পর আর শিং নাড়া দিয়ে ট্যাফোঁ করবার যো' নেই, তা সে 'মর—আর তর'!—ঘাড়ে জোয়াল বইতেই হবে। যেমন আবহমান কাল থেকে আমাদের ঠাকুরদা'দের সময় থেকে আমাদের বেলা পর্য্যন্ত হয়ে এসেছে।" মেজদা অন্যদিকে মুখ

ফিরাইয়া গুম্ফাগ্রভাগে কুঞ্চিত চক্ষের দৃষ্টি সংযত করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত গুম্ফপ্রান্ত ছাঁটিতে লাগিলেন।

কথাগুলা অবশ্য অমলের উদ্দেশে বলা হয় নাই, তাহা অমল বেশই বুঝিল, তবু কি জানি কেন,—তাহা যেন অমলের গায়ে একটু বাজিল। অমলের মনে হইল, ঐ আমাদের বেলা পর্য্যন্ত কথার মধ্যে, পরবর্ত্তিগণের প্রতি একটা গূঢ় শ্লেষের ইঙ্গিত রহিয়াছে। স্তব্ধ হইয়া সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মেজদার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কি ভাবিয়া ক্ষণপরে হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া মেজবৌদির পানে চাহিয়া, অমল সত্য সত্যই ভিতরে চমক খাইয়া দমিয়া গেল।—দেখিল স্মিতাননা মেজবৌদি প্রচ্ছন্ন রহস্যব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া নিঃশব্দ কৌতুকে হাসিতেছেন।

মুহূর্ত্তে অমলের মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল। মেজবৌদির সেই হাসিতে—সহসা 'প্রিয় বিদ্যুৎ' সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনার স্মৃতিগুলা মনের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে ঝলসিয়া উঠিল। তাহার উপর এইমাত্র মেজবৌদির অগ্রজের কাণ্ডজ্ঞান সম্বন্ধে 'ন্যায্যকথার' ধূয়া ধরিয়া, কঠোর সমালোচনার সুরে এতক্ষণ ধরিয়া যেরূপ ঝাঁজের সহিত নির্লজ্জ আস্ফালন জুড়িয়াছিল, তাহা ভাবিয়া আরও কুণ্ঠা বোধ করিল।

বিপন্ন অমল বিনাবাক্যে চম্পট দিবার জন্য ব্যাকুল হইল। ত্রস্ত চঞ্চল স্বরে বলিল, "এখন তাহলে আসি মেজদা, কলেজ যাবার সময় হয়েছে।"—অমল চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইল।

মেজবৌদি ব্যস্তভাবে মেজদার নিকট সরিয়া গিয়া মৃদুস্বরে কি বলিলেন। মেজদা ক্ষুর কাঁচি ফেলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ওরে অমু, শোন শোন, আমি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি, তোর নাওয়া খাওয়া হয় নি? তোর মেজবৌদি বলছে ঠাকুরপোকে খেয়ে যেতে বল—"

অমল ভীতিম্লানমুখে বলিল, "না, আমি নেয়ে খেয়ে এসেছি"—কথাটা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা মিথ্যা,—স্নান হইয়াছিল বটে, কিন্তু মেজদার সহিত দেখা করিবার জরুর তাগাদায় মেসের বামুনের ভাত নামাইবার বিলম্বটুকু সহ্য না করিয়াই, সে চলিয়া আসিয়াছে।

মেজদা তাহার মাথার রুক্ষ বিশৃঙ্খল কেশরাশির পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মাথার চুলগুলা উড়্ছে যে!"

অমল বি-এ পড়িতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া তৈলমাথা ছাড়িয়া দিয়াছিল, প্রতি সপ্তাহে দুইখানা করিয়া ভিনোলিয়া সাবান তাহার ব্যয় হইত, এবং প্রত্যহ তিনবার—অভাব পক্ষে দুইবার সে স্নান করিত। অবশ্য প্রতিবার স্নানের পর টেরির পারিপাট্য বিধানে, তাহার তিলার্দ্ধও মনোযোগের অভাব ঘটিত না। কিন্তু আজ সেই 'ফুল বাবু'র সৌখীনতার উপর সে এমনই ভয়ানক চটিয়া গিয়াছিল যে তাঁহার উপর প্রতিশোধ তুলিবার জন্য সযত্নে নিজের বেশভূষা বিন্যাসে আজ যথেষ্ট অযত্ন প্রকাশ করিয়াছিল। স্নানের পর টেরি পর্য্যন্ত কাটে নাই। রিষ্টওয়াচের চামড়া টান মারিয়া খুলিয়া শুধু ঘড়িটি বুকপকেটে লুকাইয়া বাহির হইয়াছিল—চোখে শুধু চশমাটি ছিল।

মেজদার কথায় মাথার চুলগুলার উপর হাত বুলাইয়া অমল সঙ্কুচিত-ভাবে বলিল, "আমি ত মাথায় তেল মাখিনে।"

মেজদা বলিলেন, "ওঃ বটে বটে!—ভুলে গেছি, তুই তেল টেল মাখিস না, কিন্তু ছাখ অমু, গায়ে তেল না মাখিস নেই নেই, কিন্তু একটা কথা বলে দিই, মাথায় একটু একটু তেল মাখিস। বড় বড় বিলাতি সাহেব যারা চব্বিশ ঘণ্টা মাথায় হ্যাট পরে ঘোরে, এদেশের ঝাঁঝাঁলো রোদে তাদেরও মাথাঘোরা সুরু হলে, তারাও ম্যাকেসার মাখতে বাধ্য হয়। আর আমরা খাঁটি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ, খোলা মাথায় আমাদের রোদে ঘুরতে হয়,

আমরা কি—ভাল কথা মনে পড়ল, থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তে কতক-গুলি সৌখীন বন্ধুর পাল্লায় পড়ে আমিও গায়ে মাথায় তেল মাখা ছেড়ে দিয়ে, তিন দিন পরে চোখে এম্নি ঘোলা দেখ্তে আরম্ভ করেছিলুম, যে চশমার অর্ডার দিই আর কি ? ভাগ্যিস মূর্খ বুড়ো ভিলেজম্যান ভজহরি চাকর পরামর্শ বাৎলে দিলে যে বাবু স্নানের সময় আচ্ছা করে সর্ব্বাঙ্গে রগড়ে সর্ষের তেল মাখ চোখের দোষ কেটে যাবে,—তাই বাঁচোয়া, নইলে চোখের মাথা এদ্দিন খেয়ে বস্তুম আর কি।"

অমলের মুখভাব অসহিষ্ণু বিরক্তিপূর্ণ হইয়া উঠিতে দেখিয়া, মেজদা আর দার্শনিক গবেষণার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিবৃতিকরণে সাহসী হইলেন না, তাড়াতাড়ি কথা উল্টাইয়া লইয়া বলিলেন—"তোর মাথার অসুখটা কেমন আছে ?"

অমল নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তেমনি—"

"ওখানে গিয়ে কিছু উপকার বুঝেছিস্ না ? তাই ত, পড়াশুনোয় তাহলে সুবিধা হচ্ছে না, বল ? কি মুস্কিল,—আর এই ক-মাস পড়ে এগ্জামিন, এ সময় কিনা মাথাটা,—"

মেজদার দুর্ভাবনা ব্যঞ্জক আক্ষেপবাণী সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অমল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "আমি এবার এগ্জামিন্ দেব না, ফার্ষ্ট চান্সে পাশ হওয়ার আশা আমার নেই—"

মেজদা, স্তব্ধ হইয়া অমলের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, 'কেন' 'কি বৃত্তান্ত' কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। কয় মুহূর্ত্ত পরে ঈষৎ ক্ষুব্ধ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ওটি আমার পক্ষে বড়ই দুঃখ, বড়ই লজ্জার বিষয় অমু—তুমি বরাবর যেমন স্কুল কলেজে 'ধারালো' ছেলে বলে নাম কিনে এসেছ, —এখান থেকেও যদি তেমনি গৌরবটি নিয়ে যথা সময়ে বেরুতে পার ভাই, তাহলে তোমার মেজদার মুখ রক্ষা হয়, না হলে আমি কারুর কাছে মুখ

দেখাতে পারব না! কাকাবাবু 'বড়মুখ' করে আমার কাছে তোমায় পাঠিয়েছেন, আমি যদি তাঁর বিশ্বাসের মর্য্যাদা না রাখ্‌তে পারি তাহলে"—মেজদা এইখানে চুপ করিয়া, কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

অমলের অন্তরের অলস নিশ্চিন্ত অসাড়তার বুকে হঠাৎ যেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা তীব্র অনুতাপের কশাঘাত বাজিল!—মুহূর্ত্তে নিজকে, একটা দায়িত্বশূন্য কাণ্ডজ্ঞানহীন অপদার্থ বলিয়া তাহার ধারণা হইল! নিজের যথেচ্ছ খেয়ালী-কৌতুকে স্বচ্ছন্দে কর্ত্তব্য অবহেলার অপরাধটা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাহার মনশ্চক্ষের সম্মুখে দীপ্যমান হইয়া উঠিল! অমলের কণ্ঠ কে যেন সজোরে নিষ্ঠুর পেষণে নিষ্পীড়িত করিয়া ধরিল। সে কোন কথা কহিতে পারিল না, মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া মেজদা বলিলেন, "থাক, দুঃখ করে আর কি হবে, চেষ্টার অনুপাতেই সিদ্ধি, ও ত জানা কথা। কিন্তু অমল, তুই যখন প্রথম কলকাতায় এলি রে, তখন তোর মুখপানে চেয়ে আমার বড় আশা হয়েছিল। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, তুই নিজের জোরে কায কিনে নিবি, তোর ওপর নজর রাখবার কোন দরকার নেই। সেই জন্যে তুই অন্য কলেজে পড়তে চাইলে—আমি তাতেও আপত্তি করি নি, বরং নিজে তার জন্যে কাকাবাবুকে সুপারিস্ করেছি। যাক, সে আমারই নির্ব্বুদ্ধিতা,—তুই ছেলে মানুষ, তোকে দোষ দেব না,—তুই বুঝিস্ নি কিন্তু আমার তখন বোঝা উচিত ছিল।"

কথাগুলা মেজদা যদি বেশ সুস্পষ্ট তিরস্কারের স্বরে বলিতেন, তাহা হইলে অমল বোধ হয় নিজের ঔদ্ধত্য বজায় রাখিতে পারিত, কিন্তু মেজদার কণ্ঠে যে সুরটা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে অমলের মন একেবারে আর্দ্র বিগলিত হইয়া গেল। আমোদের প্রলোভনে কর্ত্তব্যে অমনোযোগী হইয়া, বাজে কাযে সময়ের অপব্যবহার করিতেছে—সে

ক্ষতির খেসারৎ তাহাকে দিতে হইবে। সে দুঃখ শুধু সে নিজেই ভোগ করিবে, তাহার জন্য কষ্ট নাই, কিন্তু ঐ একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, স্নেহশীল হৃদয়টি যে তাহার ত্রুটির জন্য ক্ষুব্ধ ব্যথিত হইয়াছে, এ কষ্ট আজ অমলকে মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া দিল। অনুতপ্ত দৃষ্টিতে, অমল অধোবদন হইয়া রহিল।

মেজদা তাহার পিঠের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "সকল ভাল ছেলেই বরাবর ফার্ষ্ট চান্সে পাশ করে চল্‌বে, এমন আশা করা ভুল। তবে প্রাণপণ চেষ্টায় কর্ত্তব্যপালন করে অকৃতকার্য্য হলে, তাতে সান্ত্বনা আছে, কিন্তু অন্য কারণে অকৃতকার্য্য হলে, সে সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। তুমি এবছর না পার, আস্‌ছে বছর পাশ করে বেরুবে, তাতে ভুল নেই, কিন্তু এই একটা বছর সময়,—এটা জলের দামে বিক্রি হবার জিনিস নয় ভাই। এক দিনে, এক দণ্ডে, সংসারে কত পরিবর্ত্তন হয়ে যায় ত; এক বছরকে বিশ্বাস!—একটা মোটা কথা ধর, ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যে কাকাবাবুর চাকরীর মাথায় সমস্ত সংসারটার ভার, তোমার পড়ার ভার রয়েছে,—কে বলতে পারে হঠাৎ যদি ছ' মাসের জন্যে তাঁকে রোগে পড়তে হয়,—তাহলেই ত চক্ষুস্থির! ধরলুম না হয় খরচের জন্যে তোমার পড়ার ব্যাঘাত হতে দিলুম না, কিন্তু অমল, তখন কি আর এমন শান্ত নিশ্চিন্ত ভাবে পড়ার পিছনে মনকে সংযত রাখ্‌তে পারবে? কখনই না। পারিবারিক দুঃখ দুর্ভাবনার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তখন হয়ত আর এক পা'ও এগোতে পারবে না, অথচ এখনকার এই সুযোগ, একে স্বচ্ছন্দে হারিয়ে চলা হচ্ছে, জীবনের কি ভয়ানক অসদ্ব্যয় বল দেখি!"

আগুনই আগুনকে জ্বালাইয়া তুলে! মেজদার গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে, সেই কথাগুলি, অমলের অন্তরের সম্মুখে সত্যসত্যই ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিভীষিকা স্পষ্টরূপে অনুভব করাইয়া দিল, অমলের

মন আকুল আর্ত্তনাদে ভরিয়া উঠিল। সমস্ত ত্রুটির ন্যায্য প্রায়শ্চিত্ত, সে আজ হইতে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব মিলাইয়া পরিপূর্ণ মাত্রায় পালন করিবে-ই করিবে। এবার আর খেলা নয়, খেয়াল নয়, শুধু—কায!

ঘড়িতে টং টং করিয়া এগারটা বাজিল। সংক্ষেপে প্রণাম করিয়া অমল বলিল, "কলেজ চল্লুম।"

নবম পরিচ্ছেদ

কলেজের ফেরত বাসায় আসিয়া অমল প্রথমেই নিজের ঘরের ত্রিতল বাটীর দিকের সেই জানালাটা বেশ চাপিয়া বন্ধ করিল। তারপর নিজের ট্রাঙ্ক বই খাতাপত্রগুলা সম্মুখে টানিয়া আনিয়া এমনভাবে স্তূপাকার করিয়া রাখিল, যেন ইচ্ছা সত্ত্বেও জানালাটা আর খুলিতে না পারে।

"হৃদয়োচ্ছ্বাস" বিনিময় লব্ধ মনুসংহিতা খানি হাতে ঠেকিল। বই খুলিয়া উপহার পৃষ্ঠায় লিখিত সেই অক্ষর কয়টির উপর ভাল করিয়া দৃষ্টি বুলাইয়া, সে নিজেকে উচ্চকণ্ঠে 'গাধা' বলিয়া গালি দিল। সেদিনের আহাম্মুকিতে এমনই অন্ধ হইয়াছিল যে, এই হস্তাক্ষর কয়টা যে মেজ-বৌদির কলমের ডগা হইতে বহির্গত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারে নাই।

ইচ্ছা হইল বইখানা টান মারিয়া রাস্তায় বিসর্জ্জন দেয়, কিন্তু মনে পড়িল, ইহা আর যাহাই হউক,—বাস্তবপক্ষে এটা পরের জিনিষ!—একবার ভাবিল, চাকরের মারফৎ ইহা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। আবার ভাবিল, না থাকুক, মেজবৌদির দাদা ও ভাবী ভগিনীপতিটি সম্ভবতঃ এখন বাড়ীতে রহিয়াছেন, তাঁহারা যদি এই সূত্রে বহিখানির গমনাগমন বিভ্রাটের সংবাদ জানিয়া ফেলেন,—নাঃ, সে অসহ্য!—

অমল বহিখানা বিছানার তোষকের তলায় চাপা দিয়া রাখিল। মনে ভাবিল ইহা কোন গতিকে উপহার-দাত্রী মেজবৌদির এলেকার মধ্যে সকলের অজ্ঞাতে রাখিয়া আসিবে, তারপর তিনি যাহা খুসী তাহাই করিবেন।

নিজের "হৃদয়োচ্ছ্বাস" বহিখানির কথা মনে পড়িতেই অমলের নিশ্বাস পড়িল। ভাবিল, আহা কোনও সুযোগে এখন যদি সেখানা একবার হাতে আসিত, তাহা হইলে মলাট মুচড়াইয়া আগে তাহাকে গোলদিঘীর জলে বিসর্জ্জন দিয়া তবে সে অন্য কায করিত। নির্লজ্জ মূর্খতার এই স্মৃতিটা লোপ হইলে শান্তি পাইত।

মেজদার বাসায় ফিরিবার জন্য অমলের মন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, কিন্তু ফিরিবে কি? মেজদার শালীর বিবাহ উপলক্ষে এখন দিনকতক সেখানে যে কোলাহল উৎপাতের আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহার ভিড়ে মাথা ঢুকাইয়া চিত্তস্থৈর্য্য রক্ষা করা বড় কঠিন! অমল ঠিক করিল, মেজদার শালীর বিবাহটা না চুকিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত, নিজে এইখানে নিভৃতবাসে দিন কাটাইবে।

সকল দিক হইতে চোখ কাণ উঠাইয়া লইয়া অমল নিজের কাযে লাগিল। এক মুহূর্ত্ত সময়ও আর বৃথা নষ্ট করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু অবাধ্য মনটা—তবুও মাঝে মাঝে হাতছাড়া হইয়া, সেই অতীত ঘটনাস্মৃতিগুলার পশ্চাতে ছুটিতে বাহির হইয়া পড়িত—অমল সশঙ্ক হইয়া উঠিত। তখনই মেজদার কথাগুলা খুব ভাল করিয়া স্মৃতিপটে জাগাইয়া দুরন্ত বিদ্রোহী মনের পিঠে চাবুক মারিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠাভ্যাসে লাগিত। এক এক সময় মনের অবস্থা যখন অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিত, তখন বই ও সাইকেল লইয়া একছুটে অনিলদের শালিখার নির্জ্জন বাগানে উপস্থিত হইয়া—প্রাণপণ চেষ্টায় মনকে

সংযত করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিত। এতদিন শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র হইবার জন্য মাথা খাটাইয়া কায হাসিল করিয়া আসিতেছিল, এইবার অতর্কিত বিপ্লবের আকস্মিক আঘাতে, সত্য সত্যই তীব্রভাবে সচেতন হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়টি একান্ত আগ্রহে অকপট নিষ্ঠায় বাণী আরাধনায় উৎসর্গ করিয়া দিল।

কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় একটা অভাবনীয় উৎপাত পিছনে ছুটিয়া, তাহার মনের সুপ্ত-বিদ্রোহিতা আঘাত দিয়া জাগাইয়া মাঝে মাঝে তাহার ধৈর্য্য নষ্ট করিতে লাগিল। উৎপাতটি আর কেহ নহে, মেজদার সেই ভাবী ভায়রাভাই-পরিচিত ভদ্রলোকটী। অমল এখন নিজের কায লইয়া নিজেকে খুবই ব্যতিব্যস্ত রাখিয়াছে, এবং ঐ সুন্দর লোকটার কপাল-জোরের কথা ভাবিয়া কোনরূপ হিংসাকে মনে আমল দিয়া চিন্তা বিক্ষেপ ঘটাইবার ইচ্ছাও এখন তাহার নাই—কিন্তু কি অপরাধে কে জানে, লোকটা যেন কিছুতেই তাহাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে!—অমল যতক্ষণ ঘাড় গুঁজিয়া ঘরের কোণে পড়াশুনা করিত, ততক্ষণ জানিতে পারিত না, ঐ লোকটা বাহিরে কোথায় কি করিতেছে না-করিতেছে, এবং সেটা জানিবার চেষ্টাও এখন তাহার নিকট ভদ্রতা-বিরুদ্ধ, সুতরাং সে সম্বন্ধে বেশ উদাসীন হইয়া সময় কাটাইত। কিন্তু হইলে কি-হয়—ভদ্রলোকটি সেই 'কম্‌লি ছোড়তা নেই' প্রবাদের সার্থকতা রক্ষার জন্য যেন পূর্ণমাত্রায় ঠক্কর দিয়া চলিতে সুরু করিয়াছেন। কার্য্য উপলক্ষে অমল যখনই বাসা হইতে বাহির হইত, তখনই দেখিত ঐ লোকটী নানাছলে তাহার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে সচেষ্ট রহিয়াছে। অমল তাচ্ছিল্যের ভাণে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত, তবুও স্পষ্ট:বুঝিত, লোকটা তাহার তাচ্ছিল্যকে বেশ স্নেহপূর্ণ কৌতুকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক

এক সময় অমলের অত্যন্ত রাগ ধরিত। বিশেষতঃ সেদিন যখন শালিখার বাগানের নির্জ্জন পাঠাভ্যাসের স্থানটি পর্য্যন্ত ঐ লোকটাকে সাহেবী পোষাকে সাইকেল চড়িয়া তাহার গোপন-অনুসরণ করিতে দেখিল, তখন অমলের বিরক্তির মাত্রা এত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল যে ভাগ্যবশতঃ মেজদার খাতিরটা ঠিক সময়ে না মনে পড়িলে, সে নিশ্চয়ই সেইখানে একটা সংঘর্ষ বাধাইয়া বসিত!—অনেক কষ্টে সামলাইয়া, মনকে সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইল যে—ঐ ফুলবাবুটা নূতন বিবাহের আমোদে এখন বিশ্ব সংসারের সমস্ত প্রয়োজনীয় কাযকর্ম্মের নিকট ছুটি লইয়াছে, সুতরাং অকালে ঘুরিয়া মরা ছাড়া উহার এখন কোনই গতি নাই, অতএব যাহা খুসী সে তাহা করুক, কিন্তু অমলের পরীক্ষা আসন্ন, সুতরাং ও সব নিষ্কর্ম্মা লোকের ব্যবহারে চোখ কাণ দিবার তাহার সময় নাই।

এক এক সময় মনে করিত, বাসাটা বদ্‌লাইয়া ফেলে, কিন্তু খরচের টানাটানি, এবং সময়ের মহার্ঘতা হিসাব করিয়া, সে সঙ্কল্পে নিরস্ত হইত। লোকটির সহিত চোখোচোখী হইবার ভয়ে, বাসার কোণ ছাড়িয়া বাহির হওয়া বন্ধ করিল। কলেজের থিয়েটার পার্টির ছেলেরা আসন্ন-অভিনয়ের সুপ্রস্তুত রিহার্শেল দেখিতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া অমলের অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া এবং তাহার এ কয় দিনের নিদারুণ পাঠশ্রমে শুষ্ক শীর্ণ মুখে সে কথার প্রমাণ পাইয়া—ক্ষুন্ন মনে ফিরিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

মেজদার শালীর বিবাহের দিন যে ক্রমশঃ নিকটস্থ হইয়া আসিতেছে, এ বিষয়ে অমলের কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কোন্ তারিখে যে বিবাহটা নিশ্চিত ধার্য্য হইল, তাহার কোন সংবাদ সে জানিতে পারিল না। অবশ্য, জানিতে চেষ্টা করিবার অধিকার নাই বলিয়া সে চেষ্টা-টুকুও করিল না।

এদিকে বাসা ভাড়া লওয়ার গোণা দিনগুলি একে একে ফুরাইয়া আসিল। অমল দুশ্চিন্তায় পড়িল। গ্রীষ্মের ছুটিতে কলেজ বন্ধ হইলে, হোসেঙ্গাবাদ পলায়নের সুযোগ লাভে যে কয়দিন বিলম্ব আছে, সে কয়দিনের জন্য অগত্যা এখানে থাকিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিবে কি না তাহাই ভাবিতে লাগিল।

সেদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রথমেই ঐ চিন্তা অমলের মাথায় উদিত হইয়া, তাহার সমস্ত মনটা অত্যন্তই ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বিমর্ষ ম্লানমুখে অমল বিছানায় বসিয়াই ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে,—এমন সময় সশব্দে দ্বারে প্রকাণ্ড করাঘাত বাজিল। অমল চমকিয়া বলিল, "কে ?"

অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল—"জুজু—"

প্রাতঃকালেই ঘুমচোখে এরূপ পরিহাস কাহারও ভাল লাগে না। অমল বিরক্ত হইয়া বলিল, "কে সোজা করে বল, না হলে দোর এখন খুল্‌তে পারব না—"

বিকৃত গম্ভীর কণ্ঠে পুনশ্চ উত্তর হইল, "তোমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।"

আগন্তুকের ধৃষ্টতায় অমল অত্যন্তই চটিল। সশব্দে দ্বার খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু তখনই তাহার মুখের ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি, বিস্ময়ে লজ্জায় অন্তর্হিত হইল। দেখিল, বক্তা সুপ্রসিদ্ধ পরিহাস-রসিক জামাইবাবু—মেজদার সহোদরার স্বামী—মহিমবাবু!—আর তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া পাশে দাঁড়াইয়া—সৌম্য প্রসন্ন মূর্ত্তি মেজদা মৃদু মৃদু হাসিতেছেন!

কুণ্ঠিত অমল কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে মহিমবাবু বলিলেন, "মেজদার শালীর আজ বে,—আমরা নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়েছি, চল্, তোকেও যেতে হবে।"

অমল বলিল, "আমার এখনো মুখ ধোয়া হয় নি—"

মহিমবাবু তাহাকে ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম হচ্ছিল! এ কি, এখনো মশারি টাঙ্গান রয়েছে যে!"—একটানে মশারিটা গুটাইয়া চালের উপর ছুড়িয়া দিয়া মহিমবাবু বলিলেন, "এ কি! মশারির ভিতর আলো নিয়ে বই পড়্তে পড়্তে ঘুমান হয়েছিল? আহা শয্যাসঙ্গিনী ফিলজফির কেতাব যে এখনো মুক্ত-বক্ষে পড়ে রয়েছেন! মরি মরি—কি বাহার!—" অমলের মাথায় একটি চাঁটি মারিয়া বলিলেন, "কর্ত্তার নাকি মাথার অসুখ করেছিল? অ! —তার পর বাগান বাড়ীর বিশুদ্ধ বায়ুসেবনের ফলে এমন গাল দুটো চড়িয়ে ভাঙ্গ্‌লে কে? ভূতে?"

অমল সযত্নে আত্মদমন করিয়া, শালিখার বাগানবাটী হইতে সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে মেসের ত্রিতলের কক্ষে আসিয়া 'পৌছান'র সম্বন্ধে একটা যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ত দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সেটা মোটেই টিকিল না, উল্টা বামগণ্ডে একটা থাব্‌ড়া খাইল।

মেজদা রাম-রহিম কোন কথা না বলিয়া ক্যাম্বিশের চেয়ারটি টানিয়া লইয়া বসিয়া, বেশ নিশ্চিন্তভাবে একখানি বইয়ের পাতা উল্টাইতে

লাগিলেন। তবে তাঁহার ঠোঁটের চাপা হাসিটুকু দেখিয়া বেশ বোঝা গেল, মহিমবাবুর কথাবার্ত্তা তাঁহার কাণে খুব ভালরকমই পৌঁছিতেছে।

বিপন্ন অমল দ্বিধা ও উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া, কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। অথচ স্থাণুবৎ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া মেজদার সম্মুখে বিনা আপত্তিতে মহিমবাবুর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ গুলাও আর সহ্য করা চলে না। অগত্যা সে বিছানার উপর হইতে খাতা পেন্সিল বহি ও লণ্ঠন ইত্যাদি লইয়া যথাস্থানে সরাইতে মনোযোগী হইল।

মহিমবাবু কিন্তু ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহেন। ইত্যবসরে ঘরের চারিদিকে একবার সতর্ক চঞ্চল কটাক্ষপাত করিয়া বিনাবাক্যে অমলের গালে আর একটা চপেটাঘাত কষাইয়া দিলেন। ট্রাঙ্ক খাতা বহি ইত্যাদি সামগ্রী-সম্ভারে আবদ্ধ সেই পূর্ব্ব পরিচিত জানালাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, মহিমবাবু প্রবল গাম্ভীর্য্যের সহিত গোঁফে চাড়া দিয়া, বিস্ময়-বিমূঢ় অমলকে কড়া আওয়াজে প্রশ্ন করিলেন, “বলি, মনোবিজ্ঞান শিখ্‌তে গেলে যে শারীর-বিজ্ঞান স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এ সব তত্ত্বের কোন খোঁজই রাখ্‌তে নেই, একথা কোন্ শাস্ত্রে মাথার দিব্য দিয়ে লিখেছে বল ত ?”

অমল তাহার সঠিক সংবাদ কিছুই বলিতে পারিল না, মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, “ছোট ঘর, অনেক জিনিস-পত্র—”

ঘরের অন্যদিকের খালি কোণটা দেখাইয়া মহিমবাবু বলিলেন, “এখানকার জায়গাটা কি অপরাধে ‘একঘরে’ হ’ল, বুঝিয়ে দে ত ?—ষ্টুপিড্ কোথাকার !”

দুড়্‌দাড়্ শব্দে বহিগুলা খাটের উপর ফেলিয়া, একটানে ট্রাঙ্কটা সরাইয়া, মহিমবাবু সশব্দে ধড়াস্ করিয়া জানালাটা খুলিয়া ফেলিলেন। মুখ বাড়াইয়া একবার বাহিরের দৃশ্য বেশ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া,

পরম উৎসাহে সুউচ্চ উচ্ছ্বাসপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "আঃ—কি সুন্দর হাওয়া, কি চমৎকার আলো! মরে যাই, মরে যাইরে,—আহা এখানে দাঁড়ালে, ভাবের আবেগে হৃদয় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—"

মেজদা বই ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আঃ মহিমচন্দর, থাম ভাই, আমাকে বিয়ের বাজার করতে যেতে হবে,—ওরে অমু, মুখ ধুয়ে চল্ ভাই, হোসেঙ্গাবাদ থেকে ছেলেদের নিয়ে, কাকাবাবু কাকীমা সবাই এখানে এসেছেন—"

অমল চমকিয়া বলিল, "এ্যাঁ, বাবা, মা?—"

ব্যঙ্গস্বরে মহিমবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ!—আজ নয়,—তাঁরা পর্শু এসেছেন, খবর রাখ?"

হতভম্ব হইয়া অমল বলিল, "কিছু না!"

মহিমবাবু বলিলেন, "ওঃ—তার মানে আছে, মাথার অসুখের ঠেলায় তুমি এখন বিদেহ-কৈবল্য লাভ করেছ, কাযেই ইহলোকের খোঁজ খবর আর কিছু রাখ্‌তে সময় পাও না। এবং—"

মেজদা সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "মহিম, তোমার পায়ে পড়ি ভাই, আমার সময় নেই, কাকাবাবু নূতন বাজারে গিয়ে বসে রয়েছেন, ওদিকে বেলা ন' টার মধ্যে গায়ে হলুদ—নে নে অমু, চ।" আন্‌লা হইতে জামা টানিয়া লইয়া অমলের কাঁধের উপর ফেলিয়া দিয়া মেজদা বলিলেন, "নে জুতোটা পর্—ঘরে চাবি দে, এর পর সুবিধে মত সময়ে এসে জিনিসগুলো নিয়ে গেলেই হবে।"

মুহ্যমান অমল কলের পুতুলের মত মেজদার আদেশ নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজিয়া পালন করিল, একটি শব্দ বা এতটুকু আপত্তি প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। তিনজনে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। মেজদা নূতন বাজারের দিকে গেলেন, অমল ও মহিমবাবু মেজদার বাসায় গেলেন।

পিতামাতা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, অথচ অমল আজিও সে সংবাদ জানে না,—এই কথাটা লইয়া তাহার মনের মধ্যে খুব তোলাপাড়া চলিতেছিল. অথচ, তাঁহাদের হঠাৎ আসার কারণ কি, একথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁহার মুখে বাধিতেছিল। রাস্তায় চলিতে চলিতে একবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "মহিমবাবু, এঁরা যে সবাই হঠাৎ চলে এলেন, তার মানে কি? সবাই ভাল আছে ত?"

মহিমবাবু বলিলেন, "খুব খুব খুব,—সবাই খুব ভাল আছে, শুধু একজনেরই ব্যাধি প্রবল!—এখন তুমি ঘরের ছেলে, তোমায় ভাল-ভালয় ঘরে পৌঁছে দিতে পারলে আমি নিষ্কৃতি পাই।"

অমল ইহার পর আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

বাড়ী পৌঁছিয়া অমল দেখিল, আত্মীয় কুটুম্ব ছেলে মেয়ে ঝি চাকরে বাড়ী হৈ হৈ রৈ রৈ করিতেছে!—অমলকে দেখিয়া সকলে খুব হট্টগোল করিয়া উঠিল। কোনরূপে ভিড় ঠেলিয়া, পাশ কাটাইয়া অমল বাড়ীর ভিতর পৌঁছিয়া, রান্নাঘরে জ্যাঠাইমার নিকট উপবিষ্টা জননীকে গিয়া প্রণাম করিল। জ্যাঠাইমা দাড়ি ধরিয়া তাহাকে চুমা খাইয়া বলিলেন, "কেমন ধারা ছেলে বাবা তুই? বাড়ীশুদ্ধ লোক ধড়ফড়িয়ে মরছি, আর তুই কোথায় গিয়ে লুকিয়ে বসে রইলি বল ত?"

অমল ঘাড় চুলকাইয়া বলিল, "এক্‌জামিনের পড়া—"

জ্যাঠাইমা হর্ষস্মিত মুখে বলিলেন, "আহা হোক্ বাছা আমার মালক্ষীর প'য়ে এবার ভালয় ভালয় পাশ করে উৎরে উঠুক। আহা, বৌ যা হবে ছোট বৌ জানিস, রূপে ঘর আলো করা, যেমন আমার চাঁদের মত ছেলে, তেমনি যুগ্যি বৌ হবে।"

অমলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্তম্ভিত হইয়া বলিল, "বৌ কি বল্‌ছ জ্যাঠাইমা?"

জ্যাঠাইমা হাসিয়া বলিলেন, "শোন ছেলের পাগলামি! হ্যাঁরে তুই কি চিরকালই ছেলেমানুষ থাক্‌বি?"

অমল মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিল না। অনেক কষ্টে অনেক প্রশ্ন তর্ক ও অবিশ্বাসের পর সে নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইল যে সম্প্রতি তাহার বিবাহ—পাত্রী মেজদার শ্যালিকা।

তার পর একে একে সে শুনিল যে, মেজদার শ্বশুর হোসেঙ্গাবাদে অমলের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে মেজদার টেলিগ্রাম যায় যে "অমল বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে, তবে তাহার পরীক্ষা আসন্ন, সে জন্য সে যথাসম্ভব শীঘ্র বিবাহের গোলমাল চুকাইয়া দিয়া পরীক্ষায় প্রস্তুত হইতে ইচ্ছুক। অতএব আপনারা সত্বর আসুন।"—তদনুসারে তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়াছেন। অমল আরও শুনিল যে, মেজদা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, বিবাহের কোলাহলপূর্ণ বাসায় পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া অমল কোনও বন্ধুর বাটীতে থাকিয়া এ কয়দিন পড়াশুনা করিতেছে।

অমল রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই, মহিমবাবু কোথা হইতে আসিয়া অকস্মাৎ ক্যাঁক্‌ করিয়া তাহার ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে মেজবৌদি এয়োডালা সাজাইতেছিলেন। মহিমবাবু বলিলেন, "মেজবৌদি ফেরারি আসামী হাজির, আমি হাত দুটো ধরছি, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে, উত্তম করে' এর কাণ দুটো মলে দিন ত এবার।"

অমলের স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য—সব এবার টলিল। সে সকাতরে বলিল, "দোহাই মেজবৌদি, বালা-চুড়ির ঝঙ্কার দূর থেকেই কাণে মিষ্টি লাগে, কিন্তু কাণের খুব কাছে এসে ওটার ঝনৎকার নিরেট ধাতব পদার্থের বিশ্রী শব্দ বলেই বোধ হয়। বুঝে সুঝে কায করুন, ওর মাধুর্য্যটুকু নষ্ট করবেন না—"

মেজবৌদি স্নিগ্ধ হাস্যে মৃদুস্বরে বলিলেন, "না না, আপনার ভয় নাই, আপনি আমার শ্বশুরের ছেলে, আপনার কাণে হাত দেওয়াটা আমার উচিত হয় না, স্নেহের অনুরোধে আমি শুধু মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে পারি।"

অমল প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞকণ্ঠে বলিল, "তাই করুন—"

মহিমবাবু অমলের মাথাটা ধরিয়া মেঝের উপর কপালটা বেশ জোরের সহিত ঠুকিয়া দিয়া হতাশভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হা ভগবান্, দুনিয়ার মানুষগুলোর শেষ পর্য্যন্ত এতদূর অধঃপতন হ'ল!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকৃত ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় অমলের মাথা কাটা যাইতেছিল। সুতরাং বিবাহের উৎসবটা হইতে কোনমতে পাশ কাটাইয়া সে ঘাড় গুঁজিয়া, বই মুখে করিয়া সময় কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার উপর মহিম বাবুর নির্য্যাতন ছিল, সুতরাং অমল যথার্থই চোর বনিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

মেজদা পূর্ব্ব ঘটনার কতদূর পর্য্যন্ত জানেন অমল তাহার কোন সংবাদই পাইল না, সুতরাং মেজদার নিকট অত্যন্তই কুণ্ঠিত হইয়া রহিল। আর একটি বিষয়ে তাহার মন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল—মেজদার সেই ভাবী ভায়রা-ভাইটি হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন! অমল আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, তাঁহার নাম কাহারও মুখে একবারও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। সহস্র ব্যগ্রতা সত্ত্বেও অমল কিন্তু কাহারও নিকট কোন কথা ভরসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে

পারিল না। তা ছাড়া সে সুযোগও পাওয়া গেল না,--দুই পক্ষের উৎসবের ভিড়ে ব্যস্ত মেজদা ও মেজবৌদির মাথা চুলকাইবার সময় ছিল না।

যথাসময়ে সপারিষদ বর বিবাহবাটীতে উপস্থিত হইল। অমল দেখিল, মেজদার শ্বশুর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সহিত আর একজন সুন্দরাকৃতি যুবক আসিয়া নগ্নপদে অনাবৃত দেহে কাঁধে তোয়ালে জড়াইয়া সমাদর সৌজন্যের সহিত বরযাত্রিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। তাহার মুখখানা যেন চিনি চিনি বোধ হইল, কিন্তু ভাল চিনিতে পারা গেল না। অমল সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে সেই যুবকের পানে চাহিয়া রহিল।

তার পর সম্প্রদান স্থলে সেই ব্যক্তি যখন গরদের যোড় পরিয়া, কন্যা সম্প্রদান করিতে বসিল, তখন উজ্জ্বল আলোক সম্মুখে তাঁহার হাস্যসুন্দর মুখ এবং সোণার চশমা মোড়া চক্ষের স্নিগ্ধ কৌতুকোজ্জ্বল কটাক্ষ দেখিয়া বিস্ময়-স্তম্ভিত অমলের সকল সংশয় ঘুচিয়া গেল। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে শত ধিক্কার দিয়া সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া ভাবিল, ছি ছি ছি! অহমিকায় স্ফীত হইয়া সে যেমন বুদ্ধি গৌরবের অভিমানে অন্ধ হইয়া বানর সাজিয়াছিল, সকলে মিলিয়া তেমনই তাহাকে বানর নাচাইয়াছেন!—সোজা বুদ্ধিতে সরলভাবে চলিলে অনেক আগেই অক্লেশে বুঝিতে পারিত, এই ভদ্রলোকটি সুন্দর চেহারার অপরাধে এবং সোণার চশমা ও ডবল ব্রেষ্ট কামিজ পরিয়া ত্রিতলের ঘরে বিশ্রাম করার অজুহাতে—মেজদার ভাবী ভায়রা-ভাই কখনই হইতে পারে না বরং ভূতপূর্ব্ব শ্যালক হওয়াটাই সম্ভব ছিল। এবং এখন বুঝিল, বাস্তবিক সে তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে।

বিবাহ অন্তে বর কন্যা বাসর ঘরে প্রবেশ করিল এবং লোকজন খাওয়ানর হাঙ্গাম চুকিয়া গেলে, সুস্থ স্বচ্ছন্দ হইয়া মেজবৌদি আনন্দময়ী

মূর্ত্তিতে ঘরে আসিয়া শাদা সিল্কের রুমালে মোড়া একটি জিনিস অমলের হাতে দিলেন। অমল দেখিল রুমালের উপর রাঙা রেশমী সুতা দিয়া লেখা রহিয়াছে—

"যল্লভসে নিজ কর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্।"

রুমাল খুলিয়া দেখিল তাহার ভিতর রহিয়াছে—তাহার সেই—"হৃদয়োচ্ছ্বাস।"

মেজবৌদি বলিলেন, "ভাই ঠাকুরপো, তোমার সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিটা যে সম্পূর্ণই ইচ্ছাকৃত দুষ্টামী, সেটা আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতেও বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পেরেছিলাম। সেই জন্যে মনুর অনুশাসনতন্ত্রখানি তোমাকে দিয়ে এটা তোমার দাদার মোহমুদ্গরের নীচে চাপা দিয়ে এতদিন রেখেছিলুম। এখন তোমার বিষদাঁত ভেঙ্গেছে, কাযেই এটা মুক্ত করে তোমাকে আজ ফিরিয়ে দিচ্ছি। আর এই সঙ্গে একটি কথা বলে দিচ্ছি, সে বাড়ীর বৌদিদি আর এ বাড়ীর বড়দিদি বলে নয়, তোমাকে সত্যিকার স্নেহাস্পদ ছোট ভাইটি মনে করেই এই উপদেশটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে হৃদয়োচ্ছ্বাস জিনিসটা খুব ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু স্থান কাল পাত্র ভেদে এটা একটু বুঝে খরচ করতে হয়, এর অযথা অপব্যয়টা মোটেই ভাল নয়! তোমার অপরিচিতা বিদ্যুৎটি ভাগ্যিস্ আমার বোন ক্ষণপ্রভা হয়ে গিয়েছিল, তাই রক্ষা, কিন্তু ও যদি আর কেউ হ'ত, তাহলে—হঠাৎ হৃদয়োচ্ছ্বাস উপঢৌকন দেওয়ার ফলটি এ ক্ষেত্রে কি রকম সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াত, বল দেখি?"

ধরিত্রী সম্মুখে দ্বিধা বিদীর্ণ হইলে অধোবদন অমলের পক্ষে সে সময় বড়ই সুবিধা হইত। কিন্তু তাহা হইল না। অগত্যা সে মেঝের কার্পেটের ফুলের শোভা দেখিতে মনোনিবেশ করিল।

অমলের বামপার্শ্বে উপবিষ্ট বেনারসী ঘোমটা মোড়া বধূটিকে সস্নেহে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মেজবৌদি স্মিতমুখে বলিলেন, "আর দেখ, আমাদের এই পাগলীটার বুদ্ধিশুদ্ধি ভারি অল্প। তোমার রিহার্শেল দেখে ওর খুব ভাল লেগেছিল, সেটা বেশ জান্‌তে পেরেছি। আর ওরই কাছে খবর পেয়ে আমি অভিনয়কারীকে দেখতে গিয়ে চিনে ফেলেছিলুম যে ইনি আমারই মূর্ত্তিমান দেবর মহাশয়! কিন্তু একটা প্রয়োজনীয় খবর জানিয়ে রাখি শোন। তোমার ব্যবহার থেকে এই নির্ব্বোধটা তোমার মত সভ্য ভদ্রলোককেও একটা অসভ্য পাগল ঠাউরে ফেলেছিল! যাই হোক, ভবিষ্যতে ওর ভুল ধারণাটা ভেঙ্গে দিও,—প্রমাণ করে দিও যে তুমি অসভ্যও নও, পাগলও নও, তুমি একটা সভ্য প্রকৃতিস্থ এবং কাযের মানুষ।"

শ্যালক প্রমথবাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, "ভাই অমল, তোমার অত সখের রিহার্শেলটা মাটী হয়ে যাওয়ার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করছি। আর তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে জানাচ্ছি ভাই,—তুমি নৌকার চালে সোজা কোণ কেটে চলছিলে বেশ,—কিন্তু এই যে মাঝখান থেকে আড়াই চালে বাজিমাৎ হয়ে গেল, এর জন্যে দার্শনিক মতে, দায়ী শুধু বিধাতা। আর বৈজ্ঞানিক মতে, যদি যথার্থ দায়ী কেউ থাকে ত সে আমার বুদ্ধিমতী সহোদরা—তোমার ঐ ভালমানুষ বউদিদিটি! অবশ্য তোমার মেজদাকে নিরীহ ভদ্রলোক মনে কোর না, মনে রেখো এই আড়াই-চালের ওয়ান্-ফোর্থের জন্যে তার কেরামতি আছে। আমার পরিচয়টি তিনি যে রকম ভাবে তোমার কাছে প্রকাশ করেছেন, তার জন্যে তাঁকে জেল খাটান উচিত। কিন্তু দোহাই ভাই, আমাকে ওদের দলের একজন মনে কোর না! তোমার পাল্লায় ঠেকে আমার ভগিনীর

অনুরোধে—এ যাত্রা আমায় যেটুকু দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে, সেজন্যে আমার প্রতি তোমার করুণা প্রকাশ করা উচিত। আমার ছাপান্ন পুরুষে কেউ কখনো গোয়েন্দাগিরি করেনি, কিন্তু তোমার ওপর চোখ রাখবার জন্যে—আমাকে দিয়ে ওঁরা সে কাযও করিয়েছেন!"

মেজদা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "সে যা হবার তা হয়েছে; এখন অমল শোন তোমায় একটা কথা বলতে এলুম—এই ক'মাসের মধ্যে তোমায় বি-এ এগ্‌জামিনের জন্যে তৈরী করে তোলবার ভার আমার উপর পড়েছে। কাকাবাবু বলে দিলেন, কালই তোমায় ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে আমাদের কলেজে এসে ঢুকতে হবে"—

গাঁটছড়া বাঁধা বেনারসী উত্তরীয়খানা ঝুপ্ করিয়া বধূর ঘাড়ের উপর ফেলিয়া দিয়া তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অমল বলিল—"এখুনি—"

মেজবৌদি পথ আগলাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "দাঁড়াও, আগে রাতি বিয়েটা হয়ে যাক—"

অমল চকিতনেত্রে এদিক ওদিক চাহিয়া জড়িতস্বরে বলিল, "কিন্তু তারপর—"

মেজবৌদিদি তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া চট্ করিয়া উত্তর দিলেন, "তারপর তোমার দাদার কাছ থেকে শিখে না আসা পর্য্যন্ত, না হয় ফুলশয্যার আমোদটা মুলতুবী রাখ্‌বার ব্যবস্থা করব।"—কণ্ঠস্বর আরও খাটো করিয়া, শুধু মেজদা যাহাতে শুনিতে পান, এমনি স্বরে পুনশ্চ বলিলেন, "আর তাতেও যদি আপত্তি থাকে, তবে সেটাও না-হয় দাদার উপর বরাত দিও।"

অমল মাথাটা খুব ঝুঁকাইয়া, আলোর সম্মুখে আসিয়া অঙ্গুলিস্থ দানের আংটির 'রুবি'টা পরীক্ষা করিতে মনোযোগী হইল। মেজদা হাস্যরুদ্ধ অধরে আড়চোখে মেজবৌদির দিকে কোপকটাক্ষপাত করিয়া, শ্যালককে টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল

[নক্সা]

(১)

ডেপুটি দেবীপ্রসাদ বাবু অত্যন্ত রাশভারি জবরদস্ত হাকিম। আইনে তাঁহার সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচারকার্য্যেও তিনি সুকঠোর ন্যায়পরায়ণ লোক। পার্থিব জগতে হাকিমী কার্য্যে নিয়োগ করিবেন বলিয়াই যেন প্রকৃতি দেবী তাঁহার সুদীর্ঘ আকৃতিটি সযত্নে কালো বার্ণিশে মাজিয়া উপযুক্তরূপে ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে করিয়া দুনিয়ায় পয়দা করিয়াছিলেন। এক গেলাসের সুহৃদ্‌বর্গ বলিত, তিনি অমায়িকচিত্ত খোলা-প্রাণ মানুষ। প্রতিবেশী ও অধীনস্থ জনগণ বলিত, তাঁহার মুখের বাঘা-হাসিটুকু বড় ভয়ানক বস্তু!—মাথাটি খাইয়া, সর্ব্বনাশটি সাধিয়া, তবেই সেই হাসির মনোরম চমৎকারিতা ডেপুটিবাবুর মুখে সুপরিস্ফুট হয়।

আদালতে ডেপুটিবাবুর অসীম প্রতাপ; কিন্তু গার্হস্থ্যজীবনের সঙ্কীর্ণ আয়তনে, সে প্রতাপের প্রভাবটা অত্যন্তই সঙ্কোচ-খর্ব্ব! কারণ গৃহলক্ষ্মী মহোদয়া 'তারে-বাড়া' জবরদস্ত মানুষ। ডেপুটিবাবু মুন্সেফের পুত্র, কিন্তু গৃহিণী উকীলের কন্যা; সুতরাং বিবেচনা-শক্তিতে যাহাই হউন, বলিবার শক্তিটা তাঁহার অসাধারণ! বাড়ীর কর্ত্তা হইতে চাকর বাকর সকলেই তাঁহাকে সমীহা করিয়া চলিত।

শক্তি-সাধকের "কারণ" বা পাশ্চাত্য সভ্যতানুমোদিত "স্বাস্থ্যপান" ব্যাপারটিতে সপারিষদ ডেপুটি বাবুর প্রগাঢ় অনুরক্তি। কিন্তু এ অনু-

রাগের অবশ্যম্ভাবী ফল—বীভৎস কাণ্ডকারখানার ঝঞ্ঝাট পোহাইয়া, ডেপুটি-গৃহিণীর মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং এ বিষয়ে তিনি নিদারুণ খড়্গহস্তা ছিলেন। কিন্তু আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। যাহাই হউক—সুখের বিষয় যে ডেপুটিবাবুর কিঞ্চিৎ চক্ষুলজ্জা ছিল, সেইজন্য আত্মীয়-সমাজে কেলেঙ্কারী প্রকাশ হইবার ভয়ে তিনি উকীল-কন্যাকে কিছু খাতির করিয়া চলিতেন।—অর্থাৎ নিরীহ ভাল-মানুষ সাজিয়া লুকাইয়া মদ খাইতেন, তারপর মাতলামিটা অবশ্য প্রকাশ্যে হইত এবং নেশা ছুটিয়া সুস্থ হইলে স্ত্রীর নিকট যেরূপ সসম্মান অভ্যর্থনায় অপ্যায়িত হইতেন, তাহা অবর্ণনীয়!—মর্ম্মান্তিক মনস্তাপে কখনও বা নিজের কাণ মলিয়া শপথ করিয়া বসিতেন, এবং পরের শনিবারে অন্তরঙ্গ সুহৃদ্বর্গকে পোলাও-কালিয়ার নামে সাড়ম্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেন,—কলিকাতা হইতে ফরমাসী-পোষাক আনাইবার অছিলায়, প্যাক করা কাঠের বাক্সে প্রচুর পরিমাণে রাঙা জলের বোতল আনাইয়া, মহোল্লাসে বন্ধুগণকে স্বাস্থ্যপান করাইতেন! শেষে অনেক রাত্রে নেশা জমিবার পর বন্ধুগণ যখন আহারে বসিয়া—বা শুইয়া, মদিরালস কণ্ঠে যথেচ্ছ আনন্দে হো-হা শব্দে চীৎকার করিয়া কালিয়ার আলু চট্‌কাইয়া মাথায় মাখিত ও পোলাওয়ের পুষ্পবৃষ্টি করিয়া পরস্পরের আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত,—তখন অন্তরালে গৃহলক্ষ্মীর অন্তরটা অনাচারের ভয়ে অত্যন্তই অস্থির-চঞ্চল হইয়া উঠিত! বন্ধুবর্গের নিরঙ্কুশ কৌতুক-আনন্দে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, বন্ধুবৎসল মুন্সেফবাবু প্রীতি-ভোজের মাঝখান হইতে ছিটকাইয়া আসিয়া, হঠাৎ এক সময় সামনের আঁস্তাকুড়ে, "ড্যাং গড়াগড়ি" যাইতেন এবং সহানুভূতি-প্রবণ-চেতা সহৃদয় বন্ধুগণ, পরম ঔদার্য্যের নিদর্শন দেখাইয়া মিত্রোদ্ধার ব্রতে ব্রতী হইতে গিয়া, আবর্জ্জনাপূর্ণ আঁস্তাকুড়ের ক্লেদ-পঙ্কিল পিচ্ছল পথে পা

পিছলাইয়া,—ধড়াধ্বড় আছাড় খাইয়া, সুহৃদ্বয়ের সাযুজ্য, সালোক্য ও সারূপ্য লাভে ধন্য হইতেন! অন্তরালে ডেপুটি-গৃহিনীর বক্রকুটিল ললাট-রেখা তীব্র কঠিন হইয়া উঠিত, তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থাটা আজিও কোন মনোবিজ্ঞানবিদ্ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, সুতরাং আমরাও এ বিষয়ে কোন কথা বলিতে সাহসী নহি!

পরদিন, রবিবারের ছুটির আনন্দ আরামটা ডেপুটিবাবু পরিপূর্ণরূপে বিমল তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতেন। সোমবারে তাঁহার মেজাজের রুক্ষতায় আদালতে সেরেস্তাদার হইতে আর্দ্দালীরা পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইয়া থাকিত, সেদিন এজলাসে উপস্থিত মামলাগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইত!

(২)

ইতিমধ্যে ডেপুটিবাবুর বিশ্বস্ত আর্দ্দালী কৃপারাম পাঁড়ে গিন্নিমা'র নিকট ধমক-চমক খাইয়া, প্যাক্-করা পোষাকের বাক্সটার গুপ্ত রহস্য একদিন উদ্ঘাটন করিয়া ফেলিয়াছে! সঙ্গে-সঙ্গে মদ্যগুলি সবই গৃহিনী ঠাকুরাণীর গহনার সিন্দুকে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে! মদের অভাবে সে শনিবারের আমোদটা সাঙ্ঘাতিকরূপে "মাটী" হইয়া গেল! ডেপুটি-বাবু চটিয়া খুন!—তাহার পরই হঠাৎ একদিন 'দুত্তোর' বলিয়া তিনি এক বাগান-বাড়ী ভাড়া করিয়া ফেলিলেন! প্রত্যেক শনিবারে, ও পর্ব্বোপলক্ষে আদালত বন্ধ হইলে, বন্ধুবর্গকে লইয়া তিনি বাগান-বাড়ীতে হাজিরা দিতে লাগিলেন; বে-দরদে পয়সা উড়াইতে লাগিলেন। ডেপুটিবাবুর বয়স প্রায় চল্লিশ হইয়াছিল, সন্তানাদি হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না; কাজেই উত্তরাধিকারী অবর্ত্তমানে, কে তাঁহার

ক্লেশার্জ্জিত সম্পদ ভোগ করিবে ভাবিয়া, সুবিবেচক ডেপুটিবাবু অগত্যা নিজেই তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উড়াইয়া, উপভোগ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

গৃহ-সংসারের কাযে বিষম বিশৃঙ্খলা বাধিল! ডেপুটি-গৃহিণী বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া ডেপুটিবাবুর উচ্ছৃঙ্খলতা-বিকার সংশোধনের উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

(৩)

সে শনিবারে আদালত হইতে ফিরিতে, ডেপুটিবাবুর একটু দেরী হইয়া গিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া পোষাক ছাড়িয়া, জল খাইয়া, গোটাকতক সরকারী কাগজে তাড়াতাড়ি সহি করিয়া দিতেছিলেন। বাহিরে সহিস-কোচম্যান গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, ডেপুটিবাবুকে লইয়া এখনই বাগান-বাড়ী যাইতে হইবে।

বাহিরের সদররাস্তার উপর হইতে, ইন্‌চার্জ্জ ডেপুটি রাধাশ্যামবাবু ডাকিলেন, "দেবীবাবু, এখনো বাড়ীতে বসে কেন?"

অর্দ্ধ-সমাপ্ত সহিকরা কাগজ ফেলিয়া, ডেপুটিবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, এই যে যাই!"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একগাছি ছোট রুল হাতে করিয়া গৃহিণী ঘরে ঢুকিলেন। এবং সঙ্গে-সঙ্গে দুয়ার বন্ধ করিয়া, শিকল আঁটিয়া, সশব্দে চাবিকুলুপ লাগাইয়া চক্ষের নিমিষে চাবিটা জানালা গলাইয়া বাহিরের বারাণ্ডায় ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "নতুন ঝি, যাও চাবিটা মোনসোববাবুর স্ত্রীর কাছে রেখে এস, রাত্রি আটটার পর তিনি যখন বেড়াতে আসবেন, তখন এটা আনতে বোলো..."

'নতুন-ঝি' উক্ত মুন্সেফপত্নীর বাপের বাড়ীর দেশের মানুষ, মুন্সেফ-

পত্নীই তাহাকে এখানে চাকরী করিতে ঢুকাইয়া দিয়াছেন, দিন পনের মাত্র সে এখানে বাহাল হইয়াছে। ডেপুটিবাবু যে তাহার সামনে কোন-কিছু বলিতে পারিবেন না, তাহা গৃহিণী নিশ্চয় জানিতেন; সুতরাং নিরুদ্বিগ্নভাবে উল-কার্পেট পাড়িয়া ডেপুটিবাবুর জন্য জুতা বুনিতে বসিলেন। ঝি গুম্ গুম্ শব্দে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া ডেপুটিবাবু বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

ব্যাপার কি তাহা যে ডেপুটিবাবু খুব ভালরূপেই বুঝিয়াছেন তাহাতে গৃহিণীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, সুতরাং উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক বোধে, নিশ্চিন্তমুখে নীরবে কার্পেটের ঘর বুনিতে লাগিলেন।

নিষ্ফল আক্রোশে ঘরময় লাফালাফি ছুটাছুটি করিয়া, কাঁচের ফুলদানি গ্লাশকেশ, আয়না ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, টেবিলের জিনিসপত্র টান মারিয়া ফেলিয়া ছড়াইয়া, ডেপুটিবাবু বিপর্য্যয় উৎপাত বাধাইয়া তুলিলেন। গৃহিণী ঠাকুরাণী শান্ত-অবিচল-মুখে বসিয়া বসিয়া সমস্ত দেখিলেন, কিছু বলিলেন না।

উপরের ঘরে ডেপুটিবাবুর চীৎকার, গর্জ্জন, বকাবকি শুনিয়া রাধাশ্যামবাবু গতিক ভাল নহে বুঝিয়া নিঃশব্দে রাস্তা হইতে চম্পট দিলেন। ডাকাডাকি করিয়া তাহার সাড়া না পাওয়ায় ডেপুটিবাবু ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। দাঁত কিড়্মিড়্ করিয়া, বিকট ভঙ্গিতে মুখ খিঁচাইয়া, প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে চেয়ারের বেত ছিঁড়িয়া, লাথি মারিয়া পোষাকের আনলাটা উল্টাইয়া ফেলিয়া, চীৎকার করিয়া ডেপুটীবাবু বলিলেন, "কার হুকুমে, মুন্সেফ-বাবুর স্ত্রীর কাছে চাবি পাঠালে!"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া ডেপুটি-গৃহিণী শান্তস্বরে বলিলেন, "মাতলামি কোর না—"

ঘুসি পাকাইয়া উন্মাদ হুঙ্কারে ডেপুটিবাবু বলিলেন, "তোমার বড়

বাড়্ হয়েছে, যা খুসি তাই করছ, জানো তোমার মাথা ভেঙ্গে ফেল্‌ব, রক্তারক্তি কর্‌ব, খুন কর্‌ব !"—

কার্পেট ফেলিয়া, কোলের উপর হইতে রুলটা তুলিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া, ডেপুটি-গৃহিণী ধীরভাবে বলিলেন, "যা পারো কর, কিন্তু মাতালকে জব্দ করতে আমিও জানি ! আমি তোমার মাথাও ভাঙ্গব না, রক্তারক্তিও করব না, খুনও করব না, কিন্তু এই রুল ছুড়ে তোমার পায়ের গোছে এমন মার্‌ব, যে, পনেরো দিন যেন বিছানা ছেড়ে না উঠতে পার ! তারপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে খবর দেব, যে, আমার স্বামী মদ খেয়ে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করছিল বলে, আমি নিজেই তার পা ভেঙ্গে শয্যাশায়ী করে রেখেছি, এতে আদালতের কার্য্যক্ষতির জন্য, মাতাল ডেপুটির যা দণ্ড হওয়া উচিত হোক,—আর আমারও......"

হতবুদ্ধি ডেপুটিবাবু অবসন্ন দেহে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। ডেপুটি-গৃহিণী পুনশ্চ কার্পেট সেলায়ে মনোযোগী হইলেন। সেদিন বাগানবাড়ীতে বন্ধুগণ আসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন !

(৪)

পরের শনিবারে ডেপুটিবাবু আদালত হইতে বাহির হইয়া গাড়ী হাঁকাইয়া সরাসর বাগান-বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কোচম্যানকে বলিয়া দিলেন, "আজ রাত্রে তিনি বাড়ী ফিরিবেন না, সে গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাউক।"

সহিস কোচম্যান বাড়ী ফিরিয়া বিন্দুদাসীর মারফৎ অন্তঃপুরে সুসংবাদ পাঠাইয়া দিল।

এদিকে ডেপুটী-গৃহিণীও বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইলেন, যে, ডেপুটিবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবগণের সকলেই আজ রাত্রে গরহাজির থাকিবেন।

কারণ ডেপুটিবাবুর বাগান-বাড়ীতে আজ নাকি মহা মহোৎসব হইবে। সহরের সুপ্রসিদ্ধা চারিজন নর্ত্তকী আজ সেখানে মজুরা করিতে যাইবে। আজ সারারাত্রি সেখানে নাচ গান ও পানের স্রোত চলিবে।

গৃহিণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিলেন। তারপর বাহিরে বলিয়া পাঠাইলেন, "কোচম্যান গাড়ী লইয়া পুনশ্চ বাগান-বাড়ী গিয়া সত্বর বাবুকে লইয়া আসুক, কারণ তাঁহার পেটে কলিক ব্যথা ধরিয়াছে, অতএব বাবুর এখনই আসা চাই......"

ঘণ্টা তিন পরে কোচম্যান ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু আসিতে পারিবেন না, কারণ সহরের বড় বড় লোক সবাই আজ সেখানে সমবেত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের একা (?) ফেলিয়া চলিয়া আসাটা অত্যন্ত অভদ্রতা হয়, সেজন্য বাবু বলিয়া দিলেন যে পরিচিত ডাক্তার ভাদুড়ী মহাশয়কে ডাকিয়া রোগপ্রতীকারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করাইতে......ইত্যাদি।"

যোগ্য কর্ত্তব্যটা গৃহিণী পূর্ব্বাহ্ণেই ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন; বাহিরে বলিয়া পাঠাইলেন, "কোচম্যানকে ঘোড়া খুলতে বারণ কর, আমি ঐ গাড়ীতে এখনি বাগানে যাব!"

নতুন ঝি নিজের গালে চড় মারিয়া বলিল, "ওমা কি ঘেন্নার কথা..... "

গৃহিণী এক ধমকে তাহাকে থ করিয়া দিলেন। মাথায় বাঘাথাবা, বসাইলে কে ভিজা-বিড়াল সাজিয়া তাহা নির্ব্বিবাদে সহ্য করিবে? স্বামী যখন আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান হারাইয়া ইতর আমোদে মত্ত হইয়াছেন, তখন স্ত্রী কাহার সম্মানের ভয়ে শঙ্কিত থাকিবে? মাতালের স্ত্রীকে মাতাল স্বামীর উপযুক্তই দজ্জাল হইতে হইবে, নচেৎ তাহার সহধর্ম্মিত্ব বজায় থাকিবে কি করিয়া? এবং সংসার-ধর্ম্মই বা একাত্মা না হইলে টিকিবে কিরূপে?

এ সকল যুক্তির উপর তর্ক চালাইবার ক্ষমতা ঝিয়ের ছিল না, সে শঙ্কিতভাবে নীরবই রহিল।

বুড়া দ্বারবানটা গৃহিণীর বাপের বাড়ীর পুরান আমলের বিশ্বাসী লোক। গৃহিণীর হুকুম শুনিয়া সে মাথা চাপড়াইয়া বলিল, "হায়রে বাপ, দিদিমণি এ কা বোলে হো! জামাইবাবু আজ হাম্‌কো মার্‌ডালেগা!......"

নতুন-ঝিকে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া গৃহিণী বলিলেন, "দরওয়ানজি এস, গাড়ীর পিছনে ওঠো—"

দ্বারবান হাত জোড় করিয়া অনুনয় কাতরকণ্ঠে ব্যাপারটার অযৌক্তিকতা বুঝাইতে চেষ্টা করিল। গৃহিণী তীব্রস্বরে বলিলেন, "তুমি পাম, লাঠি বাগিয়ে গাড়ীতে চুপচাপ বসে থাক,—আমার হুকুম—"

দ্বারবান সভয়ে বলিল, "মগর্ জামাই-বাবুকো হাম মু' দেখানে নেই সেকেঙ্গে—"

গৃহিণী বলিলেন, "না পার নেই-নেই, বাগানে ঢুকে গাড়ীর কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থেক—"

গাড়ী আসিয়া বাগানবাড়ীর মধ্যে ঢুকিল! কোচম্যান দাসীর আদেশমত বাগানের দ্বারবানকে কর্ত্তার কাছে পাঠাইল। কর্ত্তা শুনিলেন, "বাড়ীর গৃহিণীর অসুখ দেখিয়া ডাক্তার বাবু এখানে আসিয়াছেন—বিশেষ জরুরি কোন কথা বলিয়া যাইতে চাহেন।"

সেই সবে-মাত্র গান ও পান সুরু হইতেছে, কর্ত্তা স-টাট্‌কা ছিলেন, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন। গাড়ীর দ্বার খুলিয়া "গুড্ ইভনিং ডক্টর" বলিয়া হাত বাড়াইয়া, সহসা ভিতরে দৃষ্টি পড়িতেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, "এ কি?—"

গৃহিণী তাঁহার হাতটা শক্তজোরে চাপিয়া ধরিলেন, অবশ্য আন্তরিক

প্রীতিপূর্ণ শুভরাত্রি ঘোষণার করমর্দ্দনের জন্য নহে, গাড়ীতে টানিয়া তুলিবার জন্যই!—কর্ত্তা হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে ভয়-ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিলেন, "কি সাহস! কি সাহস! মেয়েমানুষের এত সাহস!...ওঃ, অবাক্ করলে!..."

গৃহিণী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "গাড়ীতে ওঠো, বাড়ী যেতে হবে।"

কর্ত্তা আকুল হইয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! বাগানে উকীল মোনসোব ডেপুটিরা সবাই এসেছেন,—এ কি কেলেঙ্কারী করতে এলে, আমার জ্যান্ত মুখটা পুড়িয়ে দেবে?"

গৃহিণী ততোধিক গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আগুন-জ্বেলেছ, বাতাস দিয়েছ, নিজে মুখ বাড়িয়েছ, না হলে আমার ক্ষমতায় কি এত কুলোয়? এখন ভাল চাও ত বাড়ী চল—"

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "ভদ্রলোকরা সবাই রয়েছেন, কি বল্‌ব ওঁদের কাছে? দোহাই তোমার, বাড়ী ফিরে যাও—"

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া গৃহিণী বলিলেন, "মাত্‌লামি করবার লোভে যাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, তারা ত খুব ভদ্দর!—তুমি মানের কান্না রাখ,—ওঠো বলছি গাড়ীতে—"

প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া, মরিয়া-ভাবে কর্ত্তা বলিলেন, "আমি যেতে পারব না—"

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যেতে পারবে না? বেশ চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি,—"

কর্ত্তা ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ কর কি? কর কি? পাগল হলে না কি?—"

গৃহিণী বলিলেন "মাতালের স্ত্রীর পক্ষে পাগল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক!—"

গাড়ীর ও-পাশের দ্বার খুলিয়া গৃহিণী ডাকিলেন, "দরওয়ানজি—"

সামনে আসিয়া, লাঠি ঘাড়ে দ্বারবান মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর—"

গৃহিণী তর্জ্জনী উঁচাইয়া বলিলেন, "তুমি আমার বাপের বয়সী বুড়ো মানুষ, হুঁসিয়ার হয়ে ইজ্জত বাঁচিয়ে চোলো, মাতালের আড্ডায় যেতে হচ্ছে, সাবধান থেকো,—হুকুম দিয়ে রাখ্‌ছি, যাঁহাতক বেয়াদবি দেখবে, বে-দরদে লাঠি চালিও, তারপর মামলাবাজীর ঠেলা সাম্‌লাবে তোমার ডেপুটি মনিব! বলে রাখ্‌ছি, লাট সাহেবের নাতিই হোক্, নাৎজামাই-ই হোক্, কারুর খাতির কোরো না—চলো ঐ নাচের মজ্‌লিশে—!"

সভয়ে ডেপুটিবাবু বলিলেন, "রক্ষা কর, রক্ষা কর—আমার ঝকৃমারি হয়েছে,—পাঁচ মিনিট সময় দাও, ওঁদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে আসি—"

একটু ভাবিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা যাও, দশ মিনিটের মধ্যে না ফেরো ত আমিও ঝিকে আর দরওয়ানকে নিয়ে বরাবর তোমাদের মজলিশে গিয়ে হাজির হব, মনে রেখো—"

ত্রাহি মধুসূদন জপিতে জপিতে ডেপুটিবাবু ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন, তারপর পাঁচ মিনিট পার হইতে না-হইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুনশ্চ আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী সবেগে ছুটিয়া চলিল।

পরদিনই ভাড়া চুকাইয়া ডেপুটিবাবু বাগান-বাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধুবিচ্ছেদের বিপুল বেদনা সহিয়া সুরা সেবা পরিত্যাগ করিলেন। জীবনে আর তাহা স্পর্শ করেন নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, গৃহিণীর সুশাসন-মাহাত্ম্যে আজকাল ডেপুটিবাবুর গৃহে শান্তিদেবী স্থির-প্রতিষ্ঠ হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

বীণার সমাধি।

১

কাশ্মির হইতে মাতুলের সহিত এদেশে আসিয়া বস্ত্রের ব্যবসায় ফাঁদিবার কিছুকাল পরেই যখন এক মাত্র অভিভাবক মাতুল হঠাৎ জীবলীলা শেষ করিয়া ইহজগৎ হইতে প্রস্থান করিলেন, তখন নিরুপায় রম্বুকে বাধ্য হইয়া মহাজনের দেনা চুকাইয়া কারবার তুলিয়া দিতে হইল। তরুণ জীবন্ত প্রথম উপার্জ্জনের উদ্যমে নিরাশ হইয়া রম্বু নীরস পৃথিবীটার উপর একান্ত বিরক্ত হইয়া তাহার আজন্ম বাঞ্ছিত চির সরস সঙ্গীত সাগরের মধ্যে ডুব মারিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল। ভাবিল পৃথিবীর গোলমাল এ রাজ্যের মধ্যে পৌঁছিতে পারিবে না।

রম্বুর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট মার্জ্জিত। বাল্যাবধি নিজের চেষ্টায় ক্রমাগত আলোচনায় সে সঙ্গীত বিদ্যা অনেকটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, এখন সুযোগ পাইয়া রীতিমত শিখিবার জন্য সহরের এক বৃদ্ধ মুসলমান ওস্তাদের শরণাপন্ন হইল।

শিশুর মত সরল চপলতা ভরা অনাবিল আনন্দ উচ্ছ্বসিত প্রাণ রম্বুকে বৃদ্ধ ওস্তাদ বড় ভাল বাসিতেন। বিপত্নীক বৃদ্ধের একমাত্র পুত্র অল্পদিন হইল ইহসংসার হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছিল, শোকতপ্ত বৃদ্ধের তৃষিত অন্তর এই সংসার উদাসীন, আত্মীয়হীন উন্মুক্ত অন্তর বিদেশী যুবাকে পাইয়া আকুল আগ্রহে তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল, রম্বুর হৃদয়ও অনেক-দিনের পর একটা স্নেহ মধুর সহানুভূতির কোমল পার্শ্বে অত্যন্ত আরাম পাইয়া অতি সহজেই ধরা দিল, অল্প দিনেই এই কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ যুবার সহিত বৃদ্ধ মুসলমানের গভীর ঘনিষ্ঠতা পাকিয়া উঠিল।

দেশে রম্বুর আত্মীয় স্বজন বড় একটা কেহ ছিল না, যাহারা ছিল, তাহারাও না থাকার মধ্যে। আর দেশের উপর রম্বুর বিশেষ আগ্রহও ছিল না, সে অবাধ সঙ্গীত স্রোতে নির্ভয়ে ভাসিয়া চলিল। ওস্তাদের যত্নে দেখিতে দেখিতে অল্পদিনেই রম্বু সুদক্ষ সঙ্গীতবিদ্ হইয়া উঠিল। আনন্দ উৎসবে, বিদায় সঙ্গীতে অভিনন্দনে আগমন অভ্যর্থনায়, সভা সমিতিতে, সহরে সর্ব্বত্রই ওস্তাদজী আহূত হইতেন। ইদানীং উপযুক্ত দেখিয়া রম্বুকেও সঙ্গী করিলেন। দিন কতকের মধ্যেই রম্বুর প্রশংসাবাদে চারিদিক ঝাঁকিয়া উঠিল। খুসী হইয়া রম্বুর পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া ওস্তাদজী বলিলেন, "বাচ্চা তুমি আমার নাম রাখিবে।"

দিন পনের পরে একদিন প্রাতঃকালে বৃদ্ধ ওস্তাদ আসিয়া সুপ্তোত্থিত রম্বুকে হর্ষোচ্ছ্বসিত স্বরে সুসংবাদ দিয়া গেলেন যে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহ শিক্ষকতা করিতে তিনি সময়ে কুলাইয়া উঠিতে পারিতেন না বলিয়া, কিছুদিন আগে যে কয়টি বাড়ী ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একস্থানে রম্বুর জন্য সম্প্রতি তিনি একটী কর্ম্ম যোগাড় করিয়াছেন, কাল আসিয়া তিনি রম্বুকে সঙ্গে করিয়া তাহার কর্ম্মস্থলে লইয়া যাইবেন।

২

রম্বু নব কার্য্যে নিযুক্ত হইল। জমীদার কিশোরীপ্রসাদ সিংহ সহরের একজন গণ্যমান্য লোক। তাঁহার দুইটী শিশুপুত্র, দুইটী বালিকা কন্যা ও একটী কিশোরবয়স্ক ভাগিনেয়কে গীতবাদ্য শিক্ষা দেওয়া রম্বুর কাজ;— সময় প্রত্যহ অপরাহ্নে।

অতি শীঘ্রই শিক্ষকের সহিত ছাত্রদের অন্তরঙ্গতা ঘটিয়া গেল, ছোট ছোট ছেলেগুলির সহিত এই তরুণ শিক্ষক, তুমুল আনন্দে সঙ্গীত চর্চ্চায় মাতিয়া উঠিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অনির্দ্দিষ্ট সময়েও শিক্ষক আসিয়া ছাত্র ছাত্রীদের খোঁজ লইয়া যাইতেন। শিশুগুলিও তাঁহাকে পাইলে

যেন স্বর্গ হাতে পাইত। এক একদিন অপরাহ্নে যখন মহা কোলাহলে শিক্ষা কার্য্য চলিতে থাকিত, তখন পুরাতন ওস্তাদ রম্বুর গুরু হাসিমুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া শিক্ষক ও ছাত্রদের উৎসাহকে মুখরিত করিয়া তুলিতেন।

রম্বুর ঐকান্তিক যত্নে ছাত্রবৃন্দ স্বচ্ছন্দে অতি শীঘ্র শিখিতে লাগিল, প্রভু দেখিয়া শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কিছুদিন পরে রম্বুর বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

৩

স্নানাহার সারিয়া, গৃহদ্বারে চাবি লাগাইয়া ওস্তাদের বাসার উদ্দেশে রম্বু সবেমাত্র পথে বাহির হইয়াছে এমন সময় কিশোরী সিংহের বাটীর বালকভৃত্য কিষণ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, "শীঘ্র চল ওস্তাদ; তোমায় কর্ত্তা ডাক্‌ছেন, তোমার সেই কুকুরে কাম্‌ড়ান ওষুদটা নিয়ে চল, ওস্তাদজী বলে দিলে।"

"কাকে কুকুরে কাম্‌ড়েছে? ওস্তাদজী ওখানে রয়েছেন বুঝি" "হাঁ, নিরুমাকে কুকুরে কামড়েছে, আমাদের সেই মস্ত শীকারী কুকুরটা—শীঘ্র এস,"—রম্বু দ্রুত আসিয়া বাসার দ্বার খুলিয়া কতকগুলি ঔষধ সংগ্রহ করিয়া লইয়া সত্বর বাহির হইয়া উভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে কিশোরী সিংহের বাটীর অভিমুখে ছুটিল। কিশোরী সিংহের বাটী বেশী দূর নয়, অবিলম্বে উভয়ে আসিয়া পড়িল। পথে আসিতে আসিতে রম্বু শুনিল যে নিরুমা, ওরফে নিরলা কর্ত্তার জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে বলিয়া সে আর কাহারো সাক্ষাতে বাহির হয় না, সুতরাং রম্বু তাহাকে দেখিতে পায় নাই—আর তাহার সেই "কাশ্মিরী টোট্‌কা"য় পূর্ব্বে যে ক'জন ক্ষিপ্ত কুকুর দষ্ট লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছিল তাহারাই কিশোরীসিংহের কাছে ঔষধের গুণ ব্যক্ত করিয়াছে।

ঘটনাস্থলে আসিয়া রঘু দেখিল তথায় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে, তাহাদের সকলকে চিনিত না, মধ্যস্থলে উপবিষ্ট কিশোরী-সিংহের পাশে জীবন্ত মোমের পুতুলের মত এক অপরিচিতা সুন্দরী তরুণী নম্র আরক্ত বদনে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে দেখিলেই বুঝা যায় যে এতগুলি লোক সমাগমে সে ভারি লজ্জায় পড়িয়াছে, তাহার বাম হাতের মণিবন্ধে জড়ান ভিজা কাপড়ের পটি বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া রক্ত ঝরিতেছে।

রঘু ঘরে ঢুকিয়া অভিবাদন করিতেই ওস্তাদজী বলিলেন "ওসুদ এনেছ বাচ্ছা ?"—বিনীতভাবে রঘু সংক্ষেপে বলিল, "হাঁ"। সাগ্রহে কিশোরীসিংহ বলিলেন,"এদিকে এস বাবা, দেখ দেখি নিরুর হাতটা।" রঘুকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বালিকা অত্যন্ত জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল। লজ্জা দেখিলে বুঝি, লজ্জা আসিয়াই থাকে, রঘু হঠাৎ কেমন থতমত খাইয়া গেল। তাহার চির সঙ্কোচহীন, উন্মুক্ত হৃদয়কে সহসা একটা অস্বাভাবিক লজ্জা আসিয়া কঠিনভাবে চাপিয়া ধরিল। অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে রঘু বলিল, "দেখি হাতটা"। রক্তাক্ত জলপটিটা তুলিয়া লইয়া বালিকা উচ্চ করিয়া হাতখানি বাড়াইয়া দিল, রঘু দেখিল কুকুরের তীব্র দন্ত অনেকখানি ক্ষত করিয়াছে, মৃদু কম্পিত হস্তে সেই কোমল হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া, রঘু ক্ষতমুখে খানিকটা শ্বেতবর্ণ গুঁড়া ঔষধ অল্পে অল্পে ছড়াইয়া দিতে লাগিল। খানিক অপেক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বলছে ?"

সঙ্কোচপীড়িত রঘুর মুখের দিকে একবার লজ্জা চকিত দৃষ্টি হানিয়া অস্ফুটস্বরে বালিকা বলিল, "হাঁ"। উদ্বিগ্ন কিশোরীপ্রসাদ বলিলেন, 'কি রকম দেখছ ?" "কোন ভয় নেই, পোষা কুকুরের বিষ থাকে না, জ্বালা করছে যখন, তখন আর ভাবনা কিছু নাই।" রঘু বালিকার হাত ছাড়িয়া পিছু হটিয়া আসিল, বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী কৌটা

বাহির করিয়া খুলিয়া তিনটী বটিকা কর্ত্তার হাতে দিয়া বলিল, "তিনবার আজ খেতে হবে, প্রত্যহ যেন স্নান করান হয়, গরম জিনিস খেতে দেবেন না, তিন দিনের পর ঘা শুকিয়ে যাবে।"

বালিকার হাতে ঔষধ দিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "বুঝেছ মা" ! নতমস্তকটী মধুর ভঙ্গীতে সঞ্চালন করিয়া বালিকা মৃদুস্বরে বলিল, "আমি যাই!" —"হাঁ তুমি যাও—এখনি ওষুদ খাও গিয়ে।"

শুভ্র সুন্দর লজ্জা জড়িত পাদবিক্ষেপে বালিকা রম্বুর পাশ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, রম্বু সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল, বালিকার এলায়িত কৃষ্ণকুন্তল হইতে সুগন্ধি তৈলের স্নিগ্ধ সৌরভ উত্থিত হইয়া রম্বুর মস্তিষ্কে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিল, একটা রঙ্গীন নেশা অতর্কিতে তাহার সমস্ত হৃদয়টাকে মাতাল করিয়া তুলিল ! রম্বু দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

৪

বাস্তবিকই যখন তিন দিনের পরে নিরলার হাতের সেই গভীর ক্ষত পূরিয়া বেশ শুকাইয়া গেল, তখন কিশোরী প্রসাদ চমৎকৃত হইলেন, সেই সময় তাঁহার জমিদারী সংক্রান্ত কতকগুলি গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দিন কতকের জন্য অন্যত্র যাইতে হইয়াছিল বলিয়া, তিনি রম্বুকে কিছু বলিবার অবসর পান নাই।

কিন্তু সেই দিন হইতে রম্বুর জীবনে সত্য সত্যই যেন অভিনব নূতনত্ব আসিল। তাহার উচ্ছ্বসিত চপলতা জমাট গম্ভীর মধুময় হইয়া গেল। তাহার কৌতুকোজ্জ্বল সরল চাহনিতে একটা স্নিগ্ধ মনোরম ভাব ফুটিয়া উঠিল ! দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত পুষ্পকে যেমন মন্ত্রপূত করিতে হয়, সেইরূপ সেও আপনাকে বিশ্বগ্লানি মুক্ত পবিত্র ভাস্বর করিতে আগ্রহাকুল হইয়া উঠিল !

সে প্রাণের প্রবল ব্যগ্রতা সন্তর্পণে প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহিলেও পারিত না, আবশ্যকে অনাবশ্যকে অনেক সময় সে অনেক অসাবধানতা করিয়া শেষে বিবেকের কশাঘাতে লজ্জায় অনুতপ্ত হইত। কিন্তু হায়!—হতভাগ্য ব্রাহ্মণকুমারকে দুরাকাঙ্ক্ষার মৃত্যু-মরীচিকা যেরূপ প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিতেছিল, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করা বুঝি তাহার শক্তির অতীত ছিল। মোহের প্রখর প্রবাহে রম্বুর হৃদয় অপ্রতিহত বেগে ভাসিয়া চলিল!

সেদিন সমস্ত দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, উদ্দাম চঞ্চল হৃদয়কে গৃহকোণে বীণার ঝঙ্কারে কোনমতে সংযত করিতে না পারিয়া বীণাটী হাতে করিয়া রম্বু পথে বাহির হইয়া পড়িল। কিশোরী সিংহের বাটীর কাছাকাছি হইয়াই কিন্তু বেচারার মনে দুর্জ্জয় সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্যই তো সে হইল কি? তাহার এ দুর্ব্বলতা আসিল কোথা হইতে?

রম্বু ফিরিল, কিন্তু গৃহ মধ্যেও তিষ্ঠান দায়। যে গৃহটীতে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মাথা গুঁজিয়া এতকাল সে নিশ্চিন্ত আরামে ও সুখে ছিল সে গৃহ এখন তাহার কাছে এমন তীব্র বিষাদময় হইয়া উঠিয়াছে কেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া রম্বু ওস্তাদের বাসার দিকে আবার চলিল। আকুল আগ্রহ ও দুর্দ্দম্য সঙ্কোচে তাহার মনটা তিক্ত বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সেই নিরীহ বৃদ্ধের সুখ-সুপ্তিমগ্ন নির্জ্জন মধ্যাহ্নটী নিষ্ঠুরভাবে কলরব মুখর করিয়া তুলিতে সে দিন তাহার কিছুমাত্র দয়া হইল না। তাহার পুঞ্জীকৃত আক্রোশ কাহাকেও না পাইয়া ওস্তাদের শান্তি ধ্বংস করিতে ছুটিল।

কিন্তু ওস্তাদ তাহাকে পাইয়া কম খুসী হইলেন না! আজিকার এই বাদলের দিনে রম্বুর বীণায় মল্লারের তান, তাঁহার বড় মিঠা লাগিবে

বলিয়া তিনি খুব উৎসাহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রম্বু তাহাতে প্রফুল্ল হইতে পারিল না, তাহার মন কেমন দমিয়া গিয়াছিল।

কোন রকমে তো মধ্যাহ্নের ফাঁড়া উৎরাইয়া গেল। কিন্তু অপরাহ্নের পূর্ব্ব সূচনাতেই ভয়ঙ্কর বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। রম্বুর প্রাণ তখন বাঁধন ছিঁড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু স্নেহশীল ওস্তাদ তাহাকে সেই দুর্যোগে কিছুতেই ছাড়িলেন না। সন্ধ্যার সময় যখন বৃষ্টির বেগ ঈষৎ মন্দীভূত হইয়া আসিল, তখন ওস্তাদ আর রম্বুকে কোনক্রমেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। সে ওস্তাদের বাসায় বীণা ফেলিয়া উষ্ণীষ বস্ত্রে যথাসাধ্য আচ্ছাদিত হইয়া ভিজিতে ভিজিতে ছুটিল।

রম্বু যখন কিশোরী সিংহের বাটীতে আসিয়া পৌছিল তখন ঘরে ঘরে সন্ধ্যার দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সন্দেহে রম্বু অধীর হইয়া উঠিয়াছিল এ সময় হয় ত তাহার ছাত্র ছাত্রীদের সে শিক্ষাগারে আজ পাইবে না,—কিন্তু বাড়ী ঢুকিতেই যখন সেই পরিচিত কক্ষ হইতে বীণাধ্বনির সহিত অপরিচিত কণ্ঠের সঙ্গীত তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল তখন তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ছুটিয়া আসিয়া সেই গৃহ দাওয়ায় উঠিল, বৃষ্টির শব্দে তাহার পদশব্দ ঢাকিয়া গেল। ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় রম্বু খোলা বাতায়ন হইতে নিঃশব্দে উঁকি দিয়া দেখিল দীপালোকিত কক্ষমধ্যে তাহার শিষ্য শিষ্যারা সকলেই অন্য দিনের মত মণ্ডলী করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু মধ্যস্থলে রম্বুর আসনে বসিয়া ওকে,—! রম্বুর সর্ব্ব শরীরে তড়িৎ প্রবাহ খেলিল! নিরলা স্বয়ং বীণা বাজাইয়া মধুর স্বরে গাহিতেছে—

"ধেনু সঙ্গে, গোঠে রঙ্গে,
খেলত ব্রজ সুন্দর"

নিরলা ওস্তাদের স্বহস্ত-শিক্ষিতা ছাত্রী, সুতরাং সঙ্গীতে সে নিপুণা

হইবে তাহার আর সন্দেহ কি ? রন্টু জানিত না যে, সে বীণাতেও এমন সুন্দর সিদ্ধহস্তা! উষ্ণ আনন্দ উত্তেজনায় তাহার মস্তিষ্কের শোণিত দ্রুত ছুটাছুটী করিতে লাগিল।

সেই একদিন ব্যতীত—সেই লজ্জা সুন্দর মূর্ত্তি রন্টু আর দেখিতে এই পায় নাই। রন্টু নিশ্চয় বুঝিল সে তাহার এতটুকু শব্দ পাইলে, এখনই জমাট আনন্দময় সঙ্গীত-সভা—ভাঙ্গিয়া যাইবে। সে প্রাণপণ আপনাকে গোপন করিতে চাহিল। বুঝি সেই মুহূর্ত্তে নিজের অস্তিত্বটা পৃথিবী হইতে একেবারে লোপ করিয়া দিতে পারিলে তবে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইত। রন্টু বাতায়ন হইতে—রুদ্ধ নিঃশ্বাসে, সেই আলোকোজ্জ্বলা মোহিনী প্রতিমা অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিল, তাহার অন্তরের অভ্যন্তর হইতে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিতেছিল, আজ তাহার জীবন সার্থক! শিক্ষা সার্থক! আসন সার্থক! রন্টু তাহার সারাজীবনের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ—নিভৃত রচিত পূজার অর্ঘ সযত্নে ভক্তি-সংযতমনে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রীর চরণ উদ্দেশে নিবেদন করিল।

গান শেষ হইল, বালিকা বীণা থামাইল। বয়োজ্যেষ্ঠ বালকটি প্রশ্ন করিল, "এটা কি মূলতানি সুর দিদি ?" বালিকা উত্তর দিল, "না"—পুনশ্চঃপ্রশ্ন হইল, "তবে ভাটিয়ারী—"—"না"—"তবে গান্ধার—" "না"—"তবে ভূপালী বুঝি—" "না—" বালক সজোরে বলিল, "তবে নিশ্চয় মালশ্রী—"

রন্টু আর আবেগ দমন করিতে পারিল না, সে গৃহদ্বারে আসিয়া বলিল, "না টোরী"।

নিরলা ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, অস্ফুট স্বরে কি যেন দু একটা কথা কহিয়া লঘু কম্পিত চরণে কক্ষের অপর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল, নিজের মূঢ়তায় রন্টু অন্তরে অন্তরে নিদারুণ সন্তপ্ত হইয়া উঠিল।

ওস্তাদের আকস্মিক আবির্ভাব ও নিরলার অপ্রস্তুত তিরোভাবে—খুব একটা মজা হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া, ছেলেরা হাস্য কোলাহলে গৃহখানি মুখরিত করিয়া তুলিল।

এমন সময় কিশোরীপ্রসাদ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রম্বু সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল। স্মিতহাস্যে প্রতি নমস্কার করিয়া মুখে তিনি ছেলেদের বলিলেন—"আজ রাত্রি হয়েছে, আজ তোমাদের ছুটী দিলুম।"

ছেলেদের সহিত রম্বুও উঠিতেছিল, বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি বস ওস্তাদ!" রম্বু বসিল। তিনি বলিলেন, "তোমায় বল্‌তে সময় পাই না, কিছু মনে কোর না ওস্তাদ, আমার নিরুকে তুমি আরাম করেছ, তার জন্যে তোমায় কিছু—"

শরাহত মৃগের ন্যায় ওস্তাদ লাফাইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বশরীর দিয়া একটা উষ্ণ ঝাঁজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল, ত্রস্ত স্বরে সে বলিল, "মাপ্‌ করুন" "তা' হবে না ওস্তাদ, তা হ'লে আমি বড় দুঃখিত হ'ব।—"

তাড়াতাড়ি সিক্ত উষ্ণীষ বস্ত্রটা তুলিয়া, চৌকাটের বাহিরে এক পা বাড়াইয়া, যুক্তকরে রম্বু বলিল, "কিছু নয়, আপনি আমায় পর ভাবিবেন না।" বেশী বলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না, সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

গৃহমধ্য হইতে হাসিতে হাসিতে কর্ত্তা বলিলেন, "আচ্ছা ওস্তাদজী, নিরলার বিয়ের দিন তবে তোমার বখ্‌শীস্‌ নিয়ো।"

৫

বৃষ্টিতে ভিজিয়া সেই রাত্রেই রম্বু পীড়িত হইল। বাতশ্লেষ্মা বিকারে যখন সে লুপ্ত চৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তখন যদি জননীর মত সেবা-পরায়ণা, বৃদ্ধ ওস্তাদজী না থাকিতেন, তাহা হইলে রম্বুর বাঁচা সুকঠিন

হইত। প্রতিবেশীরা সকলেই তাহাকে ভালবাসিত, তাহারাও যথাসাধ্য সাহায্য করিল, অনেক কষ্টে ভাল হইয়া সে পঁয়তাল্লিশ দিনের পর পথ্য পাইল। কিন্তু দুর্ব্বলতার জন্য তখনও সে ভালরূপ উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিত না।

এ কয়দিন রম্মুর পীড়ার হুড়াহুড়িতে ওস্তাদজী নিজের কাজকর্ম্ম একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন একটু আধটু কাজে বাহির হইবার সময় পাইয়াছেন। রম্মুর পীড়ার সময় প্রত্যহ কিশোরীসিংহের বাটীর লোক আসিয়া তাহার খবর লইয়া যাইত, কিন্তু প্রায় পাঁচ সাত দিন কেহ আসে নাই বলিয়া, আজ রম্মু ওস্তাদজীকে বলিয়া কহিয়া তথায় পাঠাইয়া দিয়া, বীণা কোলে করিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে সময় ক্ষেপণ করিতেছিল, ক্রমে অপরাহ্নের ম্লান ছায়া গাঢ় হইয়া আসিল, রম্মু বীণার তারে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া গান ধরিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় ওস্তাদজী হাসিমুখে ঘরে ঢুকিলেন। "শরীর বেশ ভাল আছে তো রম্মু?—যাক! সিংহ মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল তাঁরা সব ভাল আছেন, কাজের ভিড়ে নিজে দেখ্‌তে আস্‌তে পারেননি বলে দুঃখ কর্‌লেন! আরো একটা সুখবর এনেছি—" উৎকণ্ঠা অধীর রম্মু মনোভাব গোপনের জন্য বীণার উপর অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া নখে করিয়া তারগুলা ধরিয়া টানিতে লাগিল। ওস্তাদ বলিলেন, "পরশু তোমায় একবার যেতে হবে, পাল্কী পাঠাইবেন বল্লেন, পরশু নিরলার বিয়ে, বিয়ের আসরে তোমায় একবার যেতেই হবে, গাইতে পার—চাই, না পার!"

উৎসাহিত ওস্তাদজী রম্মুর দিকে চাহিলেন, ঘাড় হেঁট করিয়া রম্মু গাঢ় অভিনিবেশ সহকারে তারগুলি টানিয়া টানিয়া দেখিতে লাগিল কিছু বলিল না, সহসা কটাং করিয়া একটা শব্দ হইল, চমকিয়া ওস্তাদ বলিলেন, "ওকি?"

শুকমুখে ক্লিষ্ট হাসি হাসিয়া মুখ তুলিয়া রম্বু বলিল "বীণার তার ছিড়্‌ল ওস্তাদ।" কথাটা হঠাৎ ওস্তাদের কাণে কেমন অদ্ভুত ধরণে শুনাইল, তিনি বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন।

৬

আজ নিরলার বিবাহ; চিন্তিত ওস্তাদজী একটু বেলাবেলি রম্বুর বাসায় আসিয়া দেখিলেন, রোগশীর্ণ রম্বু বাসার বাহিরে খোলা মাঠের উপর বসিয়া উদাসভাবে আকাশপানে চাহিয়া আছে। ওস্তাদ ডাকিলেন, "রম্বু!"

চমকিয়া চাহিয়া রম্বু উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার বীণার তার ছিঁড়ে গেছে, আর তো গান হবে না ওস্তাদ, তাই এখানে বীণার সমাধি দিলাম।" সত্যই সেইমাত্র সেখানকার একটা গহ্বর সদ্যমৃত্তিকা পূর্ণ করা হইয়াছে দেখা গেল, বিস্মিত ওস্তাদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

সরলমতি বালকের ন্যায় কেমন ভাবে আবার একটু হাসিয়া রম্বু বলিল, "এদেশে এসে গান বাজনা শিখেছি, তাই এদেশেই আমার সখের খেয়ালের কবর দিয়ে যাচ্ছি ওস্তাদ, আজ রাত্রেই আমি এদেশ থেকে রওনা হব। এ দেশ আর ভাল লাগ্‌ছে না!" রম্বুর বাক্যের মর্ম্মার্থ বুঝি ওস্তাদের ভাল হৃদয়ঙ্গম হইল না, তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অগ্রসর হইয়া রম্বু ডাকিল, "এস ওস্তাদ বাসার ভিতরে।"—আহত স্বরে ওস্তাদ বলিলেন, "দেশে তোমার কে আছে রম্বু" "কেউ নাই ওস্তাদ তোমার মত ভাল বাস্‌তে পারে এমন লোক—শুধু দেশে কেন সমস্ত পৃথিবীতে আর কেউ নেই তা জানি! কিন্তু কি কর্‌ব, এদেশে আর টিক্‌তে পাচ্ছি না ওস্তাদ!"

বাসার ঘরে ঢুকিয়া ওস্তাদ দেখিলেন রম্বু সত্য সত্যই তাহার জিনিস

পত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত করিয়াছে, ওস্তাদের চোখ ফাটিয়া জল আসিল, তিনি যে রম্বুকে পাইয়া পুত্রশোক ভুলিয়াছেন, সে রম্বু আজ সেই সুকোমল স্নেহ-নীর নিষ্ঠুরভাবে চূর্ণ করিয়া চলিয়া যাইবে। হায় নির্ম্মম প্রাণ, পরের সন্তান!

সেই সময় একজন লোক ঘরে ঢুকিয়া রম্বুর হাতে একখানা পত্র দিয়া বলিল, "পাল্কী এসেছে, এখনি যেতে হবে।" পত্রখানি কিশোরী প্রসাদের স্বহস্তের অনুরোধ লিপি, রম্বু বিবাহসভায় না উপস্থিত হইলে তাঁহার মনঃকষ্টের সীমা থাকিবে না।

পত্র পড়িয়া রম্বু দেয়ালের গজাল হইতে সবুজ কোর্ত্তাটী টানিয়া গায়ে দিল, বাসন্তী রংয়ের মল্‌মলের পাগড়ীটী মাথায় চড়াইয়া অগ্রসর হইয়া অত্যন্ত সহজ ভাবে বলিল, "চল ওস্তাদজী, বিয়ে বাড়ীর আনন্দ দেখে আসি।"

ওস্তাদ অবাক্! রম্বু রহস্য করিতেছে না কি? ওস্তাদ যখন দেখিলেন সত্য সত্যই রম্বু চাবি তালা হাতে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইল তখন অগত্যা তাঁহাকেও উঠিতে হইল। দেশে যাওয়ার খেয়ালটা রম্বুর দুর্ব্বল মস্তিষ্কের একটা ক্ষণিক উত্তেজনা ভাবিয়া আশঙ্কা আকুল মনকে আশ্বস্ত করিতে ওস্তাদ চেষ্টা করিলেন।

৭

পুলকমুখরিত, আলোক ঝলসিত, পুষ্প সুরভিত সমুজ্জ্বল বিবাহসভা, উচ্চাসনে মহার্হ পরিচ্ছদ ভূষিত কন্দর্পকান্তি সুকুমার বর রহিয়াছে। চারিদিকে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী গিস্ গিস্ করিতেছে, সভার মাঝখানে বীণাবাদনরত চিন্তামগ্ন ওস্তাদ, আর নতশিরে বিহ্বল, মুহ্যমান রম্বু! বাজাইতে বাজাইতে মৃদুস্বরে ওস্তাদ বলিলেন "এবার কিছু গাও রম্বু, নইলে ভাল দেখায় না, অনেকক্ষণ হয়েছে।"

রঘু করুণ নেত্রে ওস্তাদের পানে চাহিল। হায় সে আজ কি গাহিবে। একদিন জীবনের মধুর বসন্তে তাহার হৃদয় বীণা বড় মধুর সুরে বাজিয়াছিল, কিন্তু আজ আর সে দিন নাই, আজ তাহার বীণা ছিন্নতার, কণ্ঠ বেসুরা, সঙ্গীত কর্কশ! সে আজ কি করিয়া বুঝাইবে, সে কেন গাহিতে পারিতেছে না! রঘুর মুখের দিকে চাহিয়া ওস্তাদ শিহরিয়া উঠিলেন, প্রাণপণে অনিচ্ছা দমন করিয়া, কোমলতার আবরণে কঠিন আদেশকে ঢাকিয়া স্নেহময় স্বরে বলিলেন, "একটা গাও বাবা!"—বদ্ধ স্বরে রঘু বলিল, "পারব না ওস্তাদ!"

তখন ওস্তাদের ললাটে চিন্তার কালিমা ঘনাইয়া আসিল, একটু ভাবিয়া বীণার তারে কঠিন আঘাতে প্রবল শব্দ ঝঞ্ঝনা জাগাইয়া তুলিয়া গম্ভীর কণ্ঠে তিনি গান ধরিলেন, তাহার মর্ম্ম—প্রেমের পূজারী ত ভোগের ভিখারী নয়, সে যে প্রেমকে পূজা করিয়াই তৃপ্ত; সে বিনিময়-হীন, স্বার্থহীন উচ্চ ভালবাসাকেই ভালবাসে, নীচ ভোগবাসনাকে সে ঘৃণা করে, কিন্তু সঙ্কীর্ণচেতা মানব আত্মবিসর্জ্জন করিতে জানে না, সে জীয়ন্তে মৃত থাকে, সে ত জীবনে সজীবতার পরিচয় দিতে পারে না।—কিন্তু প্রেমের পূজক অমর—চির অমর!

সহসা বজ্র উন্মাদনায় রঘুর সারাপ্রাণ উন্মাদিত হইয়া উঠিল ওস্তাদ গুরু তুমি! পিতা তুমি! আজ বড় অসময়ে বড় সাহায্য করিলে! কঠিন আঘাতে প্রবল অন্তরায় ঘুচাইয়া অমৃত প্রবাহ বহিল, সহসা নিস্তব্ধ রঘু মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাসে গভীর করুণা প্লাবিত স্বরে গাহিয়া উঠিল—

"পূর্ণ হোক্ ইচ্ছা তব দেব দেব দয়াময়,
মাটীর নীচেতে তবে ঢাক নাথ সব ভয়!
সপ্তমে বেঁধেছি বীণা, দীপকে ধরেছি তান—
ছিঁড়ে যায় যাক তার, পুড়ে যায় যাক প্রাণ।

জীবন মরণ ভুলে, অনন্ত সমাধি তলে
পূজিব পরম প্রেম, পরিতাপে করি জয়।"

উচ্ছ্বসিত আত্মনিবেদন! অকপট আত্মসমর্পণ! আকাঙ্ক্ষা অভাব আনিয়াছিল, অপূর্ণতা সন্তাপকে টানিয়াছিল, আজ এক মুহূর্ত্তে উদার ত্যাগ মন্ত্রে সব কুহক বিদূরিত হইল। পূর্ণ প্রাণে সাধক সাধ্যের চরণে অন্তিম নির্ভর স্থাপন করিয়া একান্ত বিশ্বাসে গাহিল—

"পূর্ণ হোক ইচ্ছা তব দেব দেব দয়াময়!"

রঘুর পাণ্ডুর কপোলে শরীরের সমস্ত রক্ত আসিয়া জমা হইয়াছে, ললাটের শির সকল স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে,—তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে, তবু সে প্রচণ্ড উত্তেজনায় গাহিতেছে "পূর্ণ হোক ইচ্ছা তব দেব দেব দয়াময়!"

সেই সুসজ্জিত বিবাহসভা ওস্তাদের চোখে এক নিষ্ঠুর বিদ্রূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। বীণা ফেলিয়া উঠিয়া যুক্তকরে সভাস্থ সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জ্ঞানশূন্য রঘুর তুষারশীতল হস্ত ধরিয়া বাহিরে উঠাইয়া আনিলেন, বাহিরে আসিতেই রঘুর মুখ দিয়া সহসা উচ্ছ্বসিত শোণিত স্রোত প্রবল বেগে নির্গত হইল! রঘুর মূর্চ্ছিত দেহ লুটাইয়া পড়িতেই, ব্যাকুল ওস্তাদ ধরিলেন, তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক আনিতে লোক ছুটিল, কিন্তু ভিষক্ আসিবার পূর্ব্বেই রঘুর অন্তরাত্মা ইহধাম ত্যাগ করিল। চিকিৎসক আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "অতিরিক্ত উত্তেজনায় দুর্ব্বল ফুস্‌ফুস্ ফাটিয়া মৃত্যু হইয়াছে।

* * * * * *

যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ওস্তাদ সেই সমাধিস্থ বীণার উপর এক মর্ম্মর প্রস্তরের স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে লিখিয়া দিলেন "বীণার সমাধি।"

তারপর একদিন ফকিরের বেশ ধরিয়া বৃদ্ধ ওস্তাদ পথে বাহির হইলেন, জন্মের মত স্বদেশ ছাড়িয়া মক্কা যাইবার পূর্ব্বে, একবার সেই বন্ধুর বড় সাধের বীণার সমাধির কাছে গিয়া জানু পাতিয়া বসিলেন, দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু উপহার দিয়া সস্নেহে সমাধি-মূল চুম্বন করিয়া গভীর আগ্রহে তাহার উপর কিছুক্ষণ কান পাতিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল অনেক দূর হইতে মাটীর অনেক নীচে হইতে বীণাধ্বনির সহিত সেই তরুণ গায়কের কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বসিত হইতেছে—

"পূর্ণ হোক ইচ্ছা তব দেব দেব দয়াময়!"

পয়সার প্রতাপ

১

হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল নিত্যানন্দ রায়ের খানসামা নিধিরাম দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া, সতর্ক-উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল। নিধিরামের ছোট ভাই, দ্বাদশবর্ষীয় বালক,—বাবুর বড় মেয়ের ছেলে বহিবার চাকর 'খুদু' আসিয়া বলিল, "দাদা, কর্ত্তাবাবু তোমায় ডাকছেন।"

বিচিত্র সৌন্দর্য্য-রুচির পরিচায়ক, দৃষ্টি-বিভ্রমকারী বিলাস-সভ্যতার আয়োজন উপকরণ সজ্জিত প্রকাণ্ড কক্ষমধ্যে শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর উত্তরার্দ্ধ ঝুঁকাইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া, চেয়ারে বসিয়া নিধিরামের প্রভু ভোগসেবা-পরিপুষ্ট বলিষ্ঠ স্থূলকান্তি নিত্যানন্দ রায় 'তড়াত্তর' কলম চালাইতেছিলেন। কাছাকাছি কয়খানা চেয়ারে পাঁচ ছয় জন ভদ্র,

অভদ্র, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী মক্কেল বসিয়া মামলা সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। ভ্রাতার কথা শুনিয়া নিধিরাম দ্বারের পাশ হইতে কক্ষমধ্যে একবার সশঙ্কিত দৃষ্টিপাত করিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "কর্ত্তাবাবু ডাক্‌ছেন? তাইত, বাবুর কাছে মক্কেলরা বসে রয়েছে, যদি এখুনি কোন দরকার পড়ে ত?—আচ্ছা খুদু, কর্ত্তাবাবু কেন ডাক্‌ছেন জানিস?"

"জটারামকে হাঁসপাতালে পাঠান হচ্ছে, বাবুর চিঠি নিয়ে তোমায়ও সঙ্গে যেতে হবে,—"

"জটাকে? আহা"—ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিধিরাম বলিল, "রামাকে চট্ করে ডেকে আন দিকি, তাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে যাই।—আহা জটা বোধ হয় আর বাঁচবে না রে।"

অজ্ঞাতে আবার একটা নিঃশ্বাস পড়িল। বাতশ্লেষ্ম-বিকারে সহযোগী ভৃত্য জটারাম মর মর হইয়াছে, হাঁসপাতাল পাঠান'র নামে নিধিরাম নিশ্চয় বুঝিল জটার আসন্নকাল সমাগত। তাহার মনে বড় দুঃখ হইতে লাগিল,—আহা বিদেশে বিভুঁইয়ে চিরদিনটা পয়সার জন্য খাটিয়া লোকটা মরিবার সময় স্ত্রী পুত্রের মুখও দেখিতে পাইল না!

খুদু অবিলম্বে গিয়া রামা চাকরকে ডাকিয়া আনিল। নিধিরাম তাহাকে বাবুর হুকুম তামিল করিবার অপেক্ষায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া, জটার ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল।

গৃহমধ্যে উকীলবাবু, মক্কেলদের সহিত আবশ্যকীয় কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে চিঠি লেখা শেষ করিয়া থামে ঠিকানা লিখিতেছেন, এমন সময় তাঁহার ম্যানেজার বিপিন বাবু কক্ষে ঢুকিয়া সমাগত মক্কেলগণের মুখ তাকাইতে তাকাইতে,—উকীলবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কলকাতা থেকে সৌরীন চক্রবর্ত্তীর টেলিগ্রাম এল।"

চোখচ শব্দে শিরোনামা লিখিতে লিখিতে তাহারই উপর দৃষ্টিবদ্ধ রাখিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উকীল বাবু বলিলেন, "কি বলে ?"

ইতস্ততঃ করিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "বাড়ীখানার কথা—"

গম্ভীর হইয়া উকীল বাবু বলিলেন, "কাল রাত্রে চিঠি লিখে দিয়েছ ত ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা লিখে দিয়েছি, কিন্তু ওঁরা আজই রওনা হচ্চেন, কাশীতে তারাপদ বাবুকে বাড়ীর চাবির জন্যে টেলিগ্রাম কর্ত্তে বলেছেন, কেন না মেয়েছেলেরা সঙ্গে যাচ্ছেন পাছে চাবি পেতে দেরী হয় বলে—"

সদ্য লিখিত পত্রখানা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া চোখের সামনে ধরিয়া উকীলবাবু বলিলেন, "বেশ, সৌরীন বাবুকে টেলিগ্রামের কোন জবাব দিতে হবে না, তবে কাশীতে তারাপদ বাবুকে একখানা টেলিগ্রাম করে দাও যেন সৌরীন বাবু চাবি চাইলে বলে বাড়ী অন্য লোককে বিলি করা হয়েছে, তারা জিনিসপত্র বাড়ীতে রেখে গেছে, সৌরীন বাবুকে বাড়ী দিতে পারা যাবে না।"

একটু কুণ্ঠিত হইয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "যে আজ্ঞে, কিন্তু,— হাজারীমল মাড়োয়ারী শেষ পর্য্যন্ত দেড়শো টাকা দিয়ে বাড়ী ত ভাড়া করবে ? আমার সন্দেহ হয়,—শেষে যদি বলে বসে না বাবু পারলুম না, তা হলে বাড়তি কুড়ি টাকার জন্যে সৌরীন বাবুদের একশো তিরিশ টাকা ভাড়াও অনর্থক নষ্ট হবে,—তা ছাড়া ভদ্রলোককে প্রথমে কথা দেওয়া হয়েছিল।"—

চিঠির উপর হইতে চোখ তুলিয়া রুক্ষস্বরে প্রভু বলিলেন, "হয়েছিল তা হবে কি ? বেশী বোকো না।"

উদ্ধত প্রভুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর কঠিন হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া,—ব্যবস্থা-

চাতুর্য্যে সুপণ্ডিত বিপিন বাবু টেবিলের উপরকার চিঠিখানা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ-ছলে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞে—আচ্ছা এ চিঠিখানা রেজেষ্ট্রী ডাকে ডেস্‌প্যাচ্‌ করতে হবে না ?"

"হুঁ"—বলিয়া গম্ভীরভাবে চেয়ার ঘুরাইয়া লইয়া উকীল বাবু মক্কেলগণের একজনের উদ্দেশে বলিলেন, "হ্যাঁ, তার পর, আপনার কথাটা হোক,—ও লোকটা কি বলে ?"

মক্কেল বহুক্ষণব্যাপী ধৈর্য্যের সাফল্য আনন্দে কৃতার্থ হইয়া, সরিয়া নড়িয়া বসিয়া, সবিনয়ে কি একটা কথা বলিবার উপক্রম করিতেছে— সেই সময় বিপিনবাবু, উক্ত লিখিত পত্রখানি টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইবার অছিলায় আরও একটু নিকটস্থ হইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে, যেন কতকটা আপনমনেই বলিলেন, "টেলিগ্রামের কথাটা আর একটু বিবেচনা করে দেখলে হ'ত, বিদেশে বিভুঁইয়ে ভদ্রলোক মেয়েছেলে নিয়ে খামকা নাকাল হবে, অন্ততঃ দিন পনের'র জন্যে বাড়ী-খানা দিলে একুল ওকুল দুকূ'লই বজায় থাকৃত......চূণকামের খরচ বলে তাড়াতাড়ি তিনি আগামী দশ টাকা জমা করে দিয়ে গেলেন ; কাজটা......ভাল হবে কি ?........."

কথা আরম্ভ করিতে উদ্যত মক্কেল, বৃদ্ধ বিপিন বাবুর স্বগত উক্তিতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া মাঝখান হইতে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া—রুদ্ধ অপমানে ক্রুদ্ধ উকীলবাবু অকস্মাৎ তর্জ্জনী উঠাইয়া, মহা গর্জ্জনে প্রচণ্ড ধমক ঝাড়িলেন,—"রাস্কেল বিপিন, নিকালো—আবি নিকালো আমার বাড়ী থেকে! কাজের ক্ষেতি করে বক্‌বকানি ! এখুনি দূর হয়ে যাও ষ্টুপিড !"

"যে আজ্ঞে"—নিশ্চিন্ত ধৈর্য্যে অবিচল প্রসন্ন মুখে ভদ্রত্বের মর্য্যাদা-ভিমানী মাননীয় চাকুরে বাবু বৃদ্ধ বিপিনচন্দ্র হাত বাড়াইয়া টেবিলের

উপর হইতে পত্রখানা তুলিয়া লইয়া ঠিক পূর্ব্বের মতই সহজভাবে বলিলেন, "ওঁর এ মাসের খরচ পঞ্চাশ, আর উপরি কিছু দিতে হবে না..."

রুক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া উকীল বাবু বলিলেন—"না।"

বৃদ্ধ একটু বোকা বনিয়া গেছেন, বুঝিলেন যে গোপন রহস্যের সুধা-বাষ্পপূর্ণ ঐ পত্র ও টাকার কথা তুলিয়া তিনি প্রভুর উগ্রতা গলাইয়া আজটা মুঠায় পূরিতে কৌশল করিয়াছেন, তাহা ভুল হইয়াছে। বুদ্ধিমান্ প্রভু এখন অন্ততঃ মক্কেলগণের সমক্ষে সে তথ্যের এতটুকু আভাস ইঙ্গিত লইয়াও উপস্থিত সময়ে নাড়াচাড়া করিতে অনিচ্ছুক, তাই চতুর বিপিনবাবুর কারদানির চালে তাঁহার মেজাজ জল না হইয়া, উল্টা আগুন হইয়া উঠিয়াছে! থতমত খাইয়া বৃদ্ধ বিপিনচন্দ্র আর একটি কথা না কহিয়া বিজ্ঞ বুদ্ধিমানের মত ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

কাঁচা মগজের সৌখীন চড়ুইগুলা মানের খাতির লইয়া ব্যস্ত, তাহাদের সাধ্য কি যে এমন কড়া মেজাজের চড়া স্বভাবের,—ভাগ্য-লক্ষ্মীর তেজস্বী বরপুত্রের নিকট, তিনটা দিন গোলামীর গৌরব বজায় রাখিয়া টিকিয়া থাকে! পাকা মগজের বুদ্ধিমান্ বিপিন বাবু নাকি দেখিয়া শুনিয়া সেয়ানা ঘুঘু হইয়া উঠিয়াছেন, তাই অহোরাত্র প্রভুর নিকট—শুধু প্রভুর নিকট কেন, প্রভুর সাহেবী মেজাজের মাননীয় ভৃত্য—অর্থাৎ তাঁহার ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্রদ্বয়ের ইংরেজী কায়দায় উঠা, বসা, দাঁড়ান, হাঁটা, খাওয়া, শোওয়া, ঘুমান স্বপ্ন-দেখা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষাদাতা, ডবল অনার বি-এ পাস, আহার ও বাসস্থান বাদে আশী টাকা মাহিনার গৃহশিক্ষক, ঘোরতর সাহেবী মেজাজের বাঙ্গালী খৃষ্টান মিঃ জেলার্ট সাহেবের নিকটও অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইতে না হইতে ইংরেজীতে রাস্কেলিজম্ ও হিন্দীতে ও উর্দ্দুতে

গাধা, গিধ্যোড়, উল্লু শুনিয়া, এবং শূন্যে আস্ফালিত ঘুঁসির কাল্পনিক প্রহার-লাঞ্ছনা সহিয়া—সমস্ত আমলাকে 'যানে দেও' বলিয়া হাসিমুখে সসম্মানে অভিনন্দন করিয়া লইতে ছুরুস্ত হইয়াছেন। সেই জন্যই আজিও বৃদ্ধ বিপিনচন্দ্র প্রভুর অন্ন পরম পরিতোষে পরিপাক করিয়া এবং নির্ব্বিকার চিত্তে নেয়ারের খাটে নিদ্রা দিয়া প্রভুর কাজ বাজাইয়া, নিমকহালাল ভক্ত-ভৃত্য-বেশে সদম্ভে নিজের পদমর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন!—এমন ছুরূহ কৌশলের কেরামতি কি অন্যের ধাতে সহে। অসম্ভব!—গর্ব্বপ্রফুল্ল বদনে গৃহ হইতে বাহির হইয়া বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ম্যানেজার, মহাশূর প্রভুর গুপ্তসখের কারবারের দস্তুরমত ম্যানেজমেণ্ট করিতে চলিয়া গেলেন।

২

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নিধিরাম ভৃত্য, যথাসম্ভব শীঘ্র হাঁসপাতালে পীড়িত সহযোগীকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া প্রভুর কাছারী যাওয়ার তাকে সময়ের হিসাব রাখিয়া বাড়ীতে আসিয়া পৌছিয়াছে, কেন না সে-ই প্রভুর পোষাক-কামরায় ভারপ্রাপ্ত বিশ্বাসী ও কর্ম্মদক্ষ ভৃত্য। নিধিরাম উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততার সহিত প্রভুর জুতা, মোজা, প্যাণ্ট, কোট প্রভৃতি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া প্রভুর হাতে হাতে যোগাইতেছে,—এমন সময় ধীর কোমল চরণক্ষেপে, ক্ষমা সহিষ্ণুতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তির মত, উকীল বাবুর সহধর্ম্মিণী—না, না, ভুল, সহধর্ম্মিণী নয়, সহকর্ম্মিণী বলিলেও সত্যের অপলাপ হইবে বোধ হয়,—অতএব ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং মর্ম্মের সম্পর্ক হইতে বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে,—তাহারই সম্বন্ধ-সন্ধিতে কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে হরিদ্রারঞ্জিত সূতার গ্রন্থিবদ্ধ বিবাহ দ্বারা সাব্যস্ত পত্নী আখ্যায় অভিহিতা নারী,—সরমাসুন্দরী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

জরুরী কাজের তাড়া ভিন্ন তিনি এমন সময় এ কক্ষে বড় একটা প্রবেশ করেন না,—সুতরাং অল্পবয়স্ক যুবক ভৃত্য নিধিরাম, 'বড়মা'র কথাটা শেষ হইতে দিবার জন্য, কোটের গায়ে ব্রস ঘসিতে ঘসিতে বাহিরের বারেণ্ডায় চলিয়া গেল।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রথমেই পুত্রের পীড়ার সম্বন্ধে দু একটা কথা হইল। তারপর স্ত্রী একটু ইতস্ততঃ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "ত্থাখ কোটালগাঁয়ে তোমার সেই মক্কেলের বিধবা সৎমা'কে আর কেন জব্দ করছ, তার আড়াই হাজার টাকা এবার ফেলে দাও। বামুনের বিধবা, কোন দিন শাপ মন্নিতে কি হবে, আমার ত ভয় করে,—"

রুক্ষভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কঠোর স্বরে উকীলবাবু বলিলেন, "খবর্দ্দার আমার কাছে প্যান্‌প্যানাতে এস না। 'ভয় করে' আমার সামনে থেকে দূর হও।"

এরূপ সম্ভাষণ লাভ ইহাঁর নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবস্থা—সুতরাং কিছু-মাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া মিনতির স্বরে তিনি বলিলেন, "মক্কেলের ভাল মন্দ দেখা অবশ্য উচিত। কিন্তু এটা মামলা খরচের গচ্ছিত টাকা, বিধবা ধার করে দিয়েছে, তার শত্রু সতীন-পোর কথা শুনে এমন ভাবে নাহক অন্যায় করে নেওয়াটা কি..."

তর্জ্জনী উঠাইয়া অধিকতর কঠোর স্বরে স্বামী চোখ রাঙাইয়া বলিলেন, "যেমন মানুষ তেমনি থাক, বেশী বক্ বক্ কোর না। সে টাকা তাকে ফিরিয়ে দেবার মতলব থাক্‌লে এদ্দিন দিয়ে দিতুম। তাকে দেব না বলেই দিই নি, সে কি কর্ত্তে পারে করুক গে,—তুমি খবর্দ্দার এ সবে কথা কইতে এস না!"

প্রভূত উপার্জ্জনশীল, অসীম যশঃখ্যাতিসম্পন্ন 'ইন্দির চন্দোর', স্বামীর

পত্নী হওয়ার সৌভাগ্য সুযোগের জন্য চারিদিক হইতে ভাগ্যের স্তুতি শুনিতে শুনিতে সরমাসুন্দরী 'দশের' মাঝে বসিয়া গৌরবের অথইতলে তলাইয়া যান; কিন্তু স্বামীর কাছে আজীবনকাল ধরিয়া তিনি এমনই করিয়া কথার পিঠে 'থাক্‌দমা' খাইয়া আসিতেছেন,—ইহা আজ নূতন নহে! তিনি ইন্দির চন্দোর স্বামীর বংশধরগণের জননীই হউন, আর যাহাই হউন, তিনি নিজে ত একটি সামান্য ক্ষুদ্র নারী ছাড়া আর কিছুই নহেন! সুতরাং ন্যায়বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত স্বামীকে, অধর্ম্মাচার পরিহারে অনুরোধ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসহ স্পর্দ্ধা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

'যেমন মানুষ তেমনই থাকিবার' উপদেশে উকীল বাবুর স্ত্রীর বোধ হয় সদ্য সদ্য আত্ম-তত্ত্বানুভূতি জাগিল, কেন না সে প্রসঙ্গ একেবারেই ছাড়িয়া দিয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, শুষ্কমুখে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ছেলেদের মাষ্টার আজকাল বড় বেশী রাত করে বাড়ী ঢুকছেন—খাবার দাবার রোজ রাত্রে নষ্ট হচ্ছে, তাঁকে বোলো—"

চোখ পাকাইয়া উদ্ধতভাবে স্বামী বলিলেন, "কি বলব?"

কুণ্ঠিতা হইয়া স্ত্রী বলিলেন, "যদি বাড়ীতে তাঁর খাবার অসুবিধে হয় তা হলে.........।"

উকীল বাবুর ভ্রূযুগল সহজ হইল। স্ত্রীর কথায় প্রথমটা তাঁহার বিলক্ষণ সংশয় ও ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন বুঝি মাষ্টার মিঃ জেলাটের 'রাতচরা' রোগের বিরুদ্ধেই তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। কিন্তু এখন তাহা নহে বুঝিয়া আশ্বস্ত হইয়া, পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত গলার কলারের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে বলিলেন, "হুঁ, তার জন্যে কাউকে ভাব্‌তে হবে না।"

পরক্ষণেই রুক্ষকণ্ঠে ডাকিলেন, "কিরে, গাউনটা ব্রুস করা হোল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," বলিয়া ভৃত্য তাড়াতাড়ি কক্ষে ঢুকিল। প্রভু হঠাৎ অত্যন্ত কড়া আওয়াজে বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের সবাইকার মরণ-বাড় হয়েছে, না? কোন কথা বলি না তাই!—এবার জেলার্ট সাহেবের নামে কারুর মুখে যেদিন কোন কথা শুনব, সেদিন চাব্‌কে সিধে করব। জেলার্ট যা খুসী তাই করবে, তোদের বাবার কি?"

শেষের কথাটা যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল, বুঝা গেল না; অথবা মর্ম্মে মর্ম্মে কেহ সে কথা পরিষ্কাররূপে বুঝিলেও মুখে কেহ কোন কথা ফুটিলেন না,—কিন্তু বিস্মিত ভৃত্য ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। ব্যাপারটা কি হঠাৎ নিরীহ নিরপরাধ বেচারী কিছুই বুঝিতে পারিল না, সাহস করিয়া কিছু বলিতেও ভরসা হইল না, অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার মনে মনে সন্দেহ ও আশঙ্কা হইল যে, অল্পদিন পূর্ব্বে মামলা উপলক্ষে এলাহাবাদের বাংলোয় বাসকালীন ইহুদী মেমকে লইয়া প্রভু যে বাড়াবাড়িগুলা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে নিধিরামের অসতর্কতায় যে গোপন কথাগুলা অপর সকলের নিকট ফাঁস হইয়া গিয়াছে—তাহাই বুঝি সম্প্রতি কোন রকমে প্রভুর কাণে উঠিয়াছে, এবং সে বিষয়ের প্রতিই বোধ হয় কটাক্ষপাত করিয়া প্রভু এখন মাষ্টার সাহেবের প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া ইঙ্গিতে শাসনের চাবুক দেখাইতেছেন! ভৃত্য অত্যন্ত জড় সড় হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে আমি—"

"চুপ রাস্কেল।"

ভৃত্য চুপ করিল। প্রভু কোট পরিয়া হ্যাট তুলিয়া সাহেবী কায়দায় পা ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। ভৃত্য আইনের বই নথীর তাড়া প্রভৃতি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে গিয়া প্রভুকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিল।

ফিরিয়া, পোষাক কামরা বন্ধ করিতে আসিয়া ভৃত্য দেখিল—প্রভু-পত্নী তখনও সেখানে শুষ্ক ম্লান বদনে দাঁড়াইয়া এটা ওটা লইয়া

অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করিতেছেন। নিধিরাম বলিল, "বড় মা, আপনি কি এ ঘরে এখন থাকবেন?"

"না বাবা, আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি, তুমি চাবি দিয়ে যাও। আচ্ছা নিধি, তুমি সকালবেলা বাবার চিঠি নিয়ে জটারামকে হাঁসপাতালে পৌঁছে দিতে গেছলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"হাঁসপাতালের ডাক্তাররা দেখে কি বল্লেন? বাঁচবে ত?"

বিষণ্ণভাবে একটু হাসিয়া ভৃত্য বলিল যে, সবজজ বাবু আইন-সঙ্গত বিচারে পনর আনা সাড়ে তিন পাই আশা হাতের বাহির হইয়া না গেলে, সহজে কাহাকেও হাতছাড়া করেন না, সুতরাং মরণের দাখিল না হওয়া পর্য্যন্ত চাকরটাকে হাঁসপাতালে পাঠান নাই—সেই জন্য হাঁসপাতালের কর্ত্তারা জটাকে পরীক্ষা করিয়া দুঃখিত হইয়া বলিয়াছেন যে সবজজ বাবুর ক্যাশে কি মড়া ফেলার খরচটার অনটন পড়িয়াছে?

শ্বশুরের সুবিচারের খ্যাতি সম্বন্ধে এই কথাগুলা যতই কঠিনসত্য হউক, পুত্রবধূর কাণে ইহা ভাল শোনায় না—কিন্তু বড় মা অর্থাৎ উকীল বাবুর স্ত্রী সে সকল কথার কোন সায় উত্তর না দিয়া, ঈষৎ ব্যথিতভাবে শুধু বলিলেন, "আহা জটাকে তাহলে আসন্ন বিকারে ধরেছে, সে আর বাঁচবে না! দ্যাখো নিধি, তুমি বৈকালে হাঁসপাতালে গিয়ে তার খোঁজ নিও। আর, একটা টাকা দেব, ফল টল কিনে দিও।......জটাকে জিজ্ঞাসা করো যে বড় মা বলে দিলেন, তোমার কি খেতে টেতে ইচ্ছে হয় বল, বড় মা তৈরী করে পাঠিয়ে দেবেন।"

তিনি চলিয়া গেলেন। ভৃত্য কৃতজ্ঞ করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "মা গো, তোমারই পুণ্যবলে, ঐ সাক্ষাৎ কলিদেব এত অত্যাচারে অনাচারেও মান প্রাণ বাঁচাইয়া, ভাগ্যবলে ধূলামুঠা ধরিতে কড়িমুঠা

খরিয়া সংসারে আজ ধন্য হইয়াছেন, না হইলে এত উচ্ছৃঙ্খলতা কি মানুষের শরীরে বরদাস্ত হয়!……ভূত প্রেত পিশাচের দেহেও যে এত শ্রমবৈষম্যের ব্যভিচার সহ্য হয় না!"

প্রভুর সহিত অনেক দিন হইতে নানাস্থানে ঘুরিয়া নিধিরাম অনেক রকমই দেখিয়াছে। নানা স্থানের অনেক জঘন্য কুৎসিত ঘটনাচিত্র—একে একে তাহার মনে পড়িল। ঘৃণায় তাহার নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, ক্ষোভে চিত্ত অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল।……দোহাই ঈশ্বর, অন্নের কাঙাল সে, নীচ দারিদ্র্যে পরাধীন ভৃত্য সে, কিন্তু ধর্ম্মের দুয়ারে হলপ পড়িয়া বড় গলায় সে বলিতে পারে যে চরিত্রবলে সে রাজা! কিন্তু অমন ঘৃণিত চরিত্রহীনতা লইয়া, অত সম্মান সম্পদ বিদ্যা সাধ্য গৌরবে সে এক দিনের জন্যও নিজেকে বিলাসী বড়লোক করিতে চাহে না। তার চেয়ে গ্রাম্য পাঠশালার অল্পশিক্ষিত গরীব কায়স্থের ছেলে সে দেনার দায়ে ভিখারী সাজিয়া ভিক্ষান্ন ভোজন করিবে সেও ভাল, তবু—হে ভগবান, তাহাকে ধর্ম্মের সম্মুখে তাজা বুকটাকে গর্ব্বে ফুলাইয়া, মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি দিও। সে শক্তিটুকু যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে কিসের দারিদ্র্য তাহার, কিসের পরাধীনতা তাহার!

ঘর ঝাড়িতে ঝাড়িতে নিধিরাম মনে মনে ভাবিতে লাগিল, দূর হউক আর কয়টা দিন—যাহার জন্য সে স্বাধীন সম্মানের—তাহার বড় সখের চাষের কাজ ছাড়িয়া এই লক্ষ্মীছাড়া লাঞ্ছনার কাঁচা পয়সার চাকরী করিতে আসিয়াছে, তাহা ত আধা খাইয়া আধা গিরায় ঠেকিয়াছে। পৈত্রিক দেনা ত তাহার শোধ হইয়া আসিয়াছে। আর ভয় কি, আর কয়টা মাস চোখ কাণ বুজিয়া খাটিলে, তাহার পর সবই পরিষ্কার হইয়া যাইবে।… একবার দেনাটা পরিষ্কার হইলে ত হয়! তার পর মনিব বাড়ীর অন্নকে নমস্কার করিয়া, ছোট ভাই খুদুর হাত ধরিয়া; সে মার

ছেলে মার কোলে ফিরিয়া গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে। তাহার পর মনিব বাড়ীর চাকরীর সম্মানটা চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে বটে, কিন্তু জীবন থাকিতে আর এ-মুখো হইতেছে না। ম্যানেজার বিপিনবাবু বড় চাকরীর খাতিরে বড় ঝড় সহেন, কিন্তু ক্ষুদ্র ভৃত্য সে, তাহার পক্ষে অত বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝনা সহ্য করা পোষায় না!

ঘড়িটা টং টং করিয়া এগারটা বাজিল। জল খাইবার ফুরসুৎ হইয়াছে বুঝিয়া নিধিরাম পোষাক কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

৩

পরে কয় দিন কাটিয়া গিয়াছে।

আজ দুই দিন হইতে নিধিরাম চাকরের জ্বর হইয়াছে। আদা মিছরি আর মুড়কি চিবাইয়া সে অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রভুর ফরমাসের ইঙ্গিতে দুরন্ত খাটুনি খাটিতেছে। ক্লান্তি এবং অবসাদে সে ভিতরে ভিতরে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার উপর আজ সকালে হাঁসপাতালে সহযোগী জটারাম খানসামার মৃত্যু হওয়ার খবর পাইয়া অবধি মনটাও কেমন খারাপ হইয়া রহিয়াছে, কিছুই যেন ভাল লাগিতেছে না।

শীতের দ্বিপ্রহরে সদর বাড়ীর ছাদে রৌদ্রে বসিয়া নিধিরাম সূচ সূতা ও নানান ধরণের বোতাম লইয়া প্রভুর পোষাকে প্রয়োজন মত দেখিয়া শুনিয়া বসাইতেছিল। শরীর এবং মন বড়ই নিস্তেজ হইয়া আছে,—কিন্তু ব্যবহৃত পোষাকগুলা রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া না তুলিয়া রাখিলে নিস্তার নাই। প্রভু আদালতে গিয়াছেন, পোষাকে ব্রস ঘসিয়া, পাটে পাটে ন্যাপ্‌থলিন সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে নিধিরাম ভাবিতেছিল, এইবার একটু নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া ঘুমাইবে—বেলা তিনটার কমে ত হাঁড়ি

হেঁসেল উঠিবে না। গয়লার দুধ আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে—সকাল হইতে বাড়ীতে কচি ছেলের মায়েরা ষ্টোভে দুধ জ্বাল দিয়া প্রয়োজন মত ছেলেদের একটু আধটু খাওয়াইয়াছেন, বাকী দুধ বামুন ঠাকুর বেলা তিনটার পর হাঁড়ি হেঁসেল তুলিয়া নিকাইয়া, সুবিধা ও অবকাশ মত জ্বাল দিবে, সুতরাং অসুস্থ দাসদাসীগণ ততক্ষণ পর্য্যন্ত আদা মিছরি খাইয়া ক্ষুধায় টিটাইয়া থাকিতে বাধ্য। মুখফোড় দুঃসাহসী ঝি-চাকরের কেহ কেহ রাগিয়া ঝাঁজিয়া, দুই চারি কথা ঠাকুরকে শুনাইয়া, বড় মার কাণে গোলযোগ তুলিয়া সকাল সকাল দুধ জ্বাল দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া লয়; কিন্তু 'যদি হই দীন, না হইব হীন' প্রতিজ্ঞাপরায়ণ নিধিরাম সেরূপ কেলেঙ্কারী করিয়া কার্য্য হাঁসিলের পাত্র নহে। সে দরিদ্র ভৃত্য, কিন্তু তাহার মর্ম্মের মধ্যেও জ্বলন্ত যাতনার মত আত্মমর্য্যাদার তেজটুকু বজায় আছে। সুতরাং অসুস্থতার মধ্যে প্রভূত পরিশ্রমে ডাহা উপবাস তাহার সহ্য হয়, কিন্তু আহারের বিষয় লইয়া অপর কাহারও সহিত কুকুর বিড়ালের মত খেওয়োখেয়ি করা তাহার সহ্য হয় না! সেই জন্য নিধিরাম ভাবিতেছিল, দুধের অপেক্ষায় রান্নাঘরে গিয়া ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকা অপেক্ষা, নিজের ঘরে গিয়া স্বস্তিতে একটু ঘুমাইয়া সে পরিশ্রমের ক্লান্তিটা কাটাইয়া লইবে, আবার প্রভু আদালত হইতে ফিরিলেই ত উঠিয়া কাজ করিতে হইবে।

পাণ চিবাইতে চিবাইতে, কোঁচড় ভরা জোনারের খই লইয়া নিধির ভাই ক্ষুদিরাম ওরফে খুদু ছাদে উঠিয়া বলিল, "দাদা, ফুলুরীওলী মাগী টাটকা জোনারের খই ভাজছিল, তোমার জন্যে এক পয়সার কিনে নিয়ে এনু, তুমি ত সকাল থেকে কিছু খাওনি—এই কটা খেয়ে ফেল।"

চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া নিধিরাম বলিল, "তুই পয়সা কোথা পেলি?"

এক মুখ হাসিয়া খুদু বলিল, "ভাত খেতে গিয়ে ঠাকুরকে দুধ জ্বাল

দেওয়ার জন্যে বলছিলুম, ঠাকুর বল্লে, "ওঃ ভারি ত দাদার জন্যে দরদ রে, নিজের চরকায় তেল দে!' বড় মা শুনতে পেয়ে বল্লেন, 'কি হয়েছে'। আমি বল্লুম, 'দাদা সকাল থেকে কিছু খেতে পায় নি, তাই বলছি দুধটা জ্বাল দাও।' ঠাকুর বল্লে, 'আমি কি করব মা, রান্না শেষ না হলে কেমন করে দুধ জ্বাল দেব!"

নিধি চটিয়া গিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "সে ত ঠিক কথা, ঠাকুরের দোষ কি? রান্না ফেলে রেখে সে কি আমার জন্যে দুধ জ্বাল দেবে? তুই ভারি ঝগড়াটে হয়েছিস খুদে! অমন যদি করবি ত এবার বাড়ী গিয়ে দাদার কাছে তোকে রেখে আসব। বিদেশে পরের বাড়ীতে চাকরী করতে হলে 'রুইকে এক পিঠ, ভুঁইকে এক পিঠ' দিয়ে থাকতে হয়। তোর মত নবাবী করতে গেলে চলে না। তারপর, বড়মার কাছে পয়সা চেয়ে নিলি বুঝি?"

ক্ষুণ্ণ সঙ্কুচিত হইয়া খুদু বলিল, "আমি কেন চাইব, বড় মা নিজেই দিলেন। বল্লেন দুধের এখনও দেরী আছে, তোমার দাদাকে ততক্ষণ কিছু কিনে এনে দাও....।"

নিধিরাম অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন হইল। ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, এনেছিস, আজ খাচ্ছি, কিন্তু খবরদার আর কোন দিন এমন কর্ম্ম করিস নি। ছিঃ, পেটের দায়ে চাকরী করতে এসেছি বলে আমরা কি এতই ছোট লোক!......বড় বড় ঘরে এমনই সব এলো মার্কেও কারখানা, ওতে রাগ করলে কি চলে! তুই জানিস না, ছেলে মানুষ, আর কখনও এমন কাজ করিসনি, বুঝলি?"

খুদু তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল যে সে সবই বুঝিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিল যে আর কখনও এমন গর্হিত কাজ করিবে না। নিধিরাম সন্তুষ্ট হইয়াছে দেখিয়া খুদু তাহাকে যত্নসংগৃহীত

জোনারের খইগুলি খাওয়াইবার জন্য মনে মনে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সহ্য সে প্রস্তাব করিতে সাহস হইল না। একটু ভাবিয়া আহারের মজলিশে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে শ্রুত আলোচনার কথা স্মরণ করিয়া বলিল, "দাদা, বড়দিনের বন্ধে বাবুরা আগ্রা বৃন্দাবনে বেড়াতে যাবেন, 'মিনেজর' বাবুও তাঁর পরিবারকে নিয়ে সেই সঙ্গে তীর্থি করাতে যাবেন। আচ্ছা, আমাদের মাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না ?"

রুষ্টভাবে নিধি বলিল, "কি ?"—

কুণ্ঠিত হইয়া খুদু বলিল, "মার কথা বল্‌ছি—'মিনেজর' বাবুর পরিবার যদি যায়, তাহলে আমাদের মাকে নিয়ে যেতে দোষ কি ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত ঘাড় হেঁট করিয়া কোটের গায়ে সজোরে ব্রুস ঘষিয়া—নিধিরাম মুখ তুলিয়া চাহিল। তীব্র স্বরে বলিল, "তুই ছেলেমানুষ বুঝিস না, তাই একথা বল্লি, কিছু বল্লুম না। কিন্তু মনে রাখিস, আমাদের ভাত নেই তাই জাত খুইয়ে গোলামী করতে এসেছি, তা বলে মেয়েদের ইজ্জত ঘুচিয়ে দিতে আসি নি! মনিবগুষ্টির লেজুড় ধরে মাকে তীর্থি করান'র চেয়ে, ঘরে বসে চাষের ভাত খাওয়ালে মায়ের বেশী পুণ্যি হবে, মা বেশী স্বোয়াস্তিতে থাকবে। ম্যানেজার বাবুর কথা তুলিস নি, আমার ঘেন্না করে !………"

খুদু লজ্জায় পড়িয়া চুপ করিয়া রহিল, নিধিরাম পোষাক ঝাড়িয়া পাট করিতে লাগিল।

একজন অন্ধ ভিখারী তাহার সঙ্গীর সহিত সদর বাটীর গেটে প্রবেশ করিল। খুদু কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহাদের আগমনে বাধা দিল না। উকীল বাবু বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে ফাঁকতালে এইরূপ দুই একটা ভিখারীর গান তাহারা শুনিতে পায়,

তাহাতে কাহারও নিষেধ নাই; বিশেষ বুড়া কর্ত্তাবাবুও তখন অন্তঃপুরে ত্রিতলের কক্ষে ঘুমাইতেছিলেন!

"ভিখ্ মিল্‌বে নেই"—বলিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে ভিখারীকে ফিরাইয়া দিবার জন্য তখন সদর বাড়ীতে কেহ ছিল না; চাকর ও দ্বারবানগণ ঘরে ঢুকিয়া আহারান্তে ধূমপান করিতেছিল, সুতরাং ভিখারীদ্বয় সরাসর অন্তঃপুরের দ্বারে আসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া গান ধরিল :—

"হরি কোন্‌টী তোমার আসল নাম—"

মুহূর্ত্তমধ্যে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের বজ্রদীপ্ত হুঙ্কার শুনিয়া গায়কদ্বয় থতমত খাইয়া নামিয়া গেল। অন্যমনস্ক নিধিরাম চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, বহির্ব্বাটীর সম্মুখস্থ দ্বিতলের বারেন্দা হইতে কাল কুচ্‌কুচে চেহারার উপর পেণ্টুল্যান শার্ট চড়াইয়া, তাহার উপর সৌখীন কায়দায় রঙীন্ নেক্‌টাই ব্রেসেস্ আঁটিয়া মিঃ জেলার্ট মাষ্টার সাহেব চশমা চোখে বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া মুখ খিঁচাইয়া ইংরেজীতে গালাগালি করিতেছেন। গায়কদ্বয় তাঁহার বিকট উদ্ধত মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থানের উপক্রম করিল, কিন্তু মিঃ জেলার্ট তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি রাসভনিন্দিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া সাহেবী হিন্দীতে বলিলেন, "ড্যারোয়ান, ড্যারোয়ান, ডুনো রাস্কেলকো কান পাকাড়কে নিকাল ডো—"

দ্বারবান প্রতাপ মিশির তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া নিজের ঘরের চারপাই ছাড়িয়া বাহির হইল, এবং সদ্য সুপ্তিভঙ্গের সমুদয় বিরক্তি ও ক্রোধ একত্রে পুঞ্জীকৃত করিয়া, অন্ধ ভিখারীর স্কন্ধে প্রচণ্ড ধাক্কা হানিয়া রক্তচক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "চল শালে!—"

অন্ধ সামনে ঝুঁকিয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়া কাতরভাবে বলিল, "যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি,—একটু থাম"—

অসহায় অন্ধ ভিখারীর অকারণ লাঞ্ছনা দেখিয়া, পীড়িত উত্ত্যক্তচেতা নিধিরামের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে রুক্ষস্বরে হাঁকিয়া বলিল, "মানুষটা এখুনি যে পড়ে মরত !—"

দ্বারবান গঞ্জিকারঞ্জিত চক্ষু পাকাইয়া, গম্ভীর নিনাদে বলিল, "আরে সাহেবকো হুকুম—"

নিধির মেজাজটা মোটেই ভাল ছিল না। সে রাগ সামলাইতে না পারিয়া একটু রোখের সহিত-ই বলিয়া উঠিল, "আরে রাখ না তোমার হুকুম, ওরা জানে না গান গেয়েছে, তাই এত তম্বি! আর ওধারে অন্দরের দোতালায় যে খোকাবাবুরা কলের গানে "কওনা কথা মুখ তুলে বউ, দেখ চেয়ে নয়ন তুলে" বাজাচ্ছেন, তাতে বুঝি লেখাপড়ার কিছু হানি হয় না, যত অপরাধ গরীবের !—"

জেলার্ট আসলে ছিলেন, কুচ্‌কুচে কাল বাঙালী এখন প্যান্টকোটের মাহাত্ম্যে হইয়াছেন পুরা সাহেব, সুতরাং তাঁহার সাহেবী চাল ন্যায্যমাত্রার পনরগুণ উর্দ্ধে হওয়াই স্বাভাবিক। তাতে ইংরেজী বিদ্যার (?) যশো-গৌরবে তাঁহার অতুলনীয় খ্যাতি, এবং অদ্য বৈকালে স্থানীয় টাউনহলে "মধ্যপ্রদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারিণী" সভার সভাপতিত্ব কার্য্যে নিমন্ত্রিত সবজজ রায় সাহেব বাহাদুরের নিকট হইতে, সভাস্থলে তাঁহার পাঠজন্য সভাপতির নিবেদন না এমনইতর কি একটা মাথামুণ্ড বচন শীর্ষক, বিশুদ্ধ ইংরেজীতে সুললিত শব্দনিচয় সংযোগে,—দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় নির্দ্দেশক সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনার ভার পাইয়া তাঁহার মস্তিষ্ক-কারখানায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর ভিখারী গায়কের সঙ্গীত সংঘর্ষে, প্রবন্ধ রচনার নৈপুণ্য ব্যাপারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং এহেন অবস্থায় নিধিরামের সাদা বাংলা, জেলার্টের ঘূর্ণ্যবাত্যা-মধ্যবর্ত্তী রঙীন মেজাজের উপর একেবারে জ্বালাময়ী দীপকের

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া দিল। জেলার্ট সক্রোধে বারেন্দার রেলিংয়ের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া গর্জ্জিলেন, "হোয়াট ডু ইউ সে ব্রুট্?"

নিধির হাড়ের ভিতর জ্বালা করিতেছিল। সে চাহিয়া দেখিল ভিখারীদ্বয় বাড়ীর সীমানা ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। নিশ্চিন্ত নির্ভীক হইয়া নিধিরাম তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া ভাল করিয়া একবার জেলার্ট সাহেবের মুখপানে তাকাইল। তার পর, তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তরদান অনাবশ্যক বোধে, দৃষ্টি ফিরাইয়া নীরবে নিজের কাজে মনোনিবেশ করিল।

নিঃশব্দ অবজ্ঞার অপমানে আহত জেলার্ট প্রতিহিংসা-প্রোজ্জ্বলচিত্তে কটমট চক্ষে নিধিরামের দিকে তাকাইয়া, বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে সেখান হইতে সরিয়া গেল। ভয়সঙ্কুচিত খুদু মৃদুস্বরে বলিল, "মাষ্টার সাহেবের চোখ যেন আলিপুরের চিড়িয়াখানার গণ্ডারের চোখ।"

নিধির ধমকে অপ্রতিভ হইয়া খুদু থামিল। নিধির সহযোগী ভৃত্য মোহন খানসামা হাসিতে হাসিতে ছাদে উঠিয়া সকৌতুকে বলিল, "তোর জয়জয়কার হোক দাদা! আচ্ছা শুনিয়েছিস্। ব্যাটা গজ গজ কচ্ছে কি জানিস? তোর চাকরী খাবে!—"

"খাক না। ওরা সায়েব সুবো মানুষ, ওদের হজ শক্তিটা বড্ড বেশী। ওরা সব পেটে পুরতে পারে, আমার চাকরী খাবে, এ আর বেশী কথা কি? আমায় ত খেতে পারবে না! আমার এক দুয়োর মোদা ত হাজার খোলা। চুলোয় যাক। তুই ভাই এই পোষাকের বোঝাটা নিয়ে আয়ত, পোষাক কামরার দেরাজে সব তুলে ফেলি গে। আর খুদু, তুই এই কলার গুলো—আচ্ছা দাঁড়া, দেখি তোর হাত ময়লা নয়ত?—আচ্ছা হবে, এই কলার গুলো সাবধানে নিয়ে আয়, দেখিস যেন চাপে দোম্ড়ায় না। আর, আমি এখন বাড়ীতে দাদাকে একখানা চিঠি লিখে

গিয়ে শোব।—যদি ঘুমিয়ে পড়ি, মোহন তুই ভাই তাক্‌নিমে করে থাকিস্‌, বাবু কাছারী থেকে এলেই উঠিয়ে দিবি।"

"তা দেব। হাঁরে দাদা নিধি, তোদের গাঁয়ের সেই চাষা মহাজন বেহারী ঘোষের দেনা সব শোধ করেছিস ?"

"কিছু বাকী আছে দাদা, সেইটুকু শোধ হ'লেই গঙ্গা নেয়ে বাড়ী ফিরি!"

"তার একটা সঙ্গীন মামলা বাবুর হাতে আছে না ? সে মামলার কি হল ?"

"কে জানে দাদা, আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখি না।"

"কিন্তু যাই বলিস দাদা, আচ্ছা ফাঁসুড়ে নচ্ছার লোক তোদের মহাজন! দেড়শো টাকায় উকীল দিয়ে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে মামলা চালাতে পারছে, আর সাড়ে আটশো টাকার জন্যে তোদের দুদিন সবুর দিলে না, নতুন খৎ লিখিয়ে নিয়ে তবে ছাড়লে!"

ক্ষুব্ধ বিষাদের হাসি হাসিয়া নিধিরাম বলিল, "এসা দিন নেহি রহে গা। আর আশীটে টাকা বাকী আছে। এ বছর আর দাদাকে চাষের ধান খড় বিক্রী করতে দিচ্ছি নে—খেটে শোধ করব। ক'টা মাস সবুর কর, তা পর দেনা শুধে, মা কালীকে জোড়া পাঁটায় পূজো দিয়ে, তোদের পেসাদ পাবার নেমন্তন্ন করব। দেনায় কাবু করেছে, কি বলব! না হলে কায়েত-বাচ্চা কি খানসামার কাজে খাট্‌তে আসি রে!"

৪

বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ প্রায়।

জলযোগান্তে দাদাকে পত্র লেখা শেষ করিয়া, পত্রখানা ডাকবাক্‌সে ফেলিবে বলিয়া বিছানার পাশে রাখিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত নিধিরাম বৃথা নিদ্রার

চেষ্টায় নির্জ্জন গৃহে ছিন্ন মলিন মাদুরের উপর পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতেছে—আর বিষাদখিন্নচিত্তে ভাবিতেছে, তাহার নিভৃত পল্লী প্রান্তের ক্ষুদ্র সুন্দর শান্তিপূর্ণ কুটীরখানির কথা!

নিধি অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল। তাহার নিদ্রা চটিয়া গেল। বাড়ীর অনেক কথাই একে একে মনে পড়িতে লাগিল—বার্দ্ধক্য জীর্ণা মাতার কথা মনে পড়িল,—চাষের কাজে স্বাধীন পরিশ্রমী স্নেহশীল অগ্রজের ব্যবহার মনে পড়িল, খুদুর ছোট,—মাতার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান শিবুর কথা মনে হইল, আর মনে হইল, তারই মাঝখানে সেই অল্পদিন পূর্ব্বের স্বহস্তে শাঁখা সিন্দুর ঘোমটা পরাইয়া—অগ্নি ব্রাহ্মণ সমক্ষে মন্ত্র পড়িয়া স্বগোত্রে উন্নীত করিয়া লওয়া একটি বালিকার কচি মুখ।...অলস নিস্তেজ হৃৎপিণ্ডটা বুকের মধ্যে আনন্দের আরামে পরম উৎসাহে দুলিতে লাগিল। নিধিরাম অতীত এবং বর্ত্তমানকে ডিঙ্গাইয়া ভবিষ্যতের অঙ্কে বিপুল আয়োজন উৎসবের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

প্রফুল্লমুখে মোহন খানসামা ঘরে ঢুকিয়া, মুদ্রিত চক্ষে নিস্পন্দভাবে চিন্তাশীল নিধিকে তাড়া দিয়া বলিল, "ওরে নিধি দাদা, ওঠ্ ওঠ্ ঝপ করে ওঠ্, বাবু তোকে ডাক্‌ছেন!"

"বাবু! এর মধ্যে আদালত থেকে ফিরে এলেন!"—বলিয়া নিধি ত্রস্তভাবে গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। লিখিত পত্রখানা শয্যানিম্নে চাপা দিয়া বলিল—"এত সকাল সকাল আজ ফিরলেন, কি রকম বল দেখি?"

মোহন রঙ্গ করিয়া বলিল, "তোর মহাজনের মামলার কথা কি বলেন, আর—"

নিধির রসিকতা করিবার অবকাশ ছিল না, সে তৎক্ষণাৎ পোষাক কামরার চাবি লইয়া ছুটিয়া চলিল। উকীল বাবু তখন বসিবার ঘরে একটা চেয়ারে বসিয়া অত্যন্ত অপ্রসন্ন গম্ভীরমুখে একখানা মোটা আইনের

বই খুলিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পড়িতেছিলেন। আজ আদালতে একটা বড় মামলায় হারিয়া এবং বিপক্ষ পক্ষের উকীলের কাছে অপমানসূচক ব্যঙ্গশ্লেষের খোঁচা থাইয়া তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত অসহিষ্ণু উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।—সেই জন্য তিনি অসময়ে আদালত হইতে চলিয়া আসিয়াছেন; বাড়ীতে আসিয়া পোষাক না ছাড়িয়াই তিনি সেই পরাজিত মামলার কোন বিষয় সম্বন্ধে আইনের যুক্তিসিদ্ধান্ত অনুসন্ধান করিতে বসিয়াছিলেন।

নিধি ঘরে ঢুকিয়া দেখিল,—ইতিমধ্যে কখন মাষ্টার সাহেব আসিয়া উকীলবাবুর কাছে হাজির হইয়াছেন। সে নিঃসংশয়ে বুঝিল, তাহারই বিরুদ্ধে কোন কিছু অভিযোগ লইয়া তিনি বলিতে আসিয়াছেন,—কিন্তু নিজের বিপদাশঙ্কায় পিছু হটা চলে না, নিধি কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া প্রভুর সম্মুখে আসিয়া সবিনয়ে বলিল, "হুজুর আপনার পোষাক কামরার—"

হুজুর দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া রক্তচক্ষে বলিলেন, "সকাল বেলা সাহেবের চা আন্‌তে দেরী করেছিলি কেন শূয়ার?"

"আমি ত দেরী করিনি হুজুর, আমি ঠিক সময়েই চা এনেছিনু। সায়েব তখন ঘরে খিল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। আমি ডেকে ফিরে গেনু, হয় না হয় মোহনকে জিজ্ঞাসা করুন,—"

"জিজ্ঞাসা!"—অধীর ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উকীল বাবু লাফাইয়া হস্তস্থিত মোটা মলাটযুক্ত আইন পুস্তকের দ্বারা নিধির রগে সজোরে আঘাত করিলেন।

নিধির চক্ষে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার দেখাইল। ঘূর্ণিত মস্তিষ্কে অবসন্ন দেহে সে বসিয়া পড়িল।

ক্রোধোন্মত্ত উকীল বাবু কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া বুটজুতাশুদ্ধ লাথি,

হুদ্দাড় শব্দে নিধির পৃষ্ঠে পাঁজরে মস্তকে, যেখানে পাইলেন, সজোরে বসাইতে লাগিলেন। নিধি স্তব্ধ নিঝুমভাবে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল, একটি শব্দও উচ্চারণ করিল না।

প্যাণ্টালুনের পকেটে হাত পুরিয়া সাহেবী ভঙ্গীতে সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সভ্য গ্র্যাজুয়েট মিঃ জেলার্ট আসুরিক আনন্দ-দীপ্ত নয়নে, প্রতিহিংসার জয়গর্ব্বে হাস্যপূর্ণ বদনে, সেই নৃশংস কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন; একবার বলিলেন না, মহাশয় থামুন!

মোহন খানসামা জানিত না যে হতভাগ্য নিধিকে উকীল বাবু কিসের জন্য ডাকিয়াছেন,—সে রহস্য ছলেই মিছামিছি মামলার নাম করিয়া নিধিকে ডাকিয়া দিয়াছিল। সহসা প্রভুর গৃহ হইতে ক্রুদ্ধ গর্জ্জনের সহিত ভীষণ প্রহারের শব্দ পাইয়া, উৎকণ্ঠিত চিত্তে অন্যান্য ভৃত্যের সহিত সে ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দেখিল, যাহা আশঙ্কা করিয়াছে তাহাই ঠিক ঘটিয়াছে, তবে শুধু হাত নহে—পাও চলিতেছে! প্রভু তখনও নিধির পাঁজরে উপর্য্যুপরি লাথি বসাইতেছেন।

ভৃত্যগণ স্তম্ভিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য হতভম্বভাবে দাঁড়াইল। বাবুর হাত ধরিয়া থামান যায় না, তাহারা নিধিকে টানিয়া সরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সরিবে কে? নিধি তখন সংজ্ঞাহীন—সম্পূর্ণ অচেতন! মোহন মরিয়া হইয়া প্রভুকে ঠেলিয়া সরাইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "হুজুর ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন,—নিধি মরে গেছে বোধ হয়!"

যুদ্ধক্লান্ত হুজুর হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। মিঃ জেলার্ট সরিয়া আসিয়া নিধির মাথায় জুতার ঠোকর মারিয়া বলিলেন, "মিথ্যে ছল! ওঠ্ ব্যাটা!"

ভৃত্যগণ নিধিকে টানিয়া ফিরাইল। নিধির চক্ষু তখন কপালে উঠিয়াছে, জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, মুখের কস বহিয়া ভল্ ভল্

করিয়া রক্ত নির্গত হইতেছে! একজন ভৃত্য ছুটিয়া জল আনিয়া তাহার মুখে দিতে গেল।

মিঃ জেলার্ট বাধা দিয়া বলিলেন, "এইও ষ্টুপিড্, ম্যাটিং করা মেঝেয় জল পড়লে মাটী হয়ে যাবে, একে তোরা অন্য জায়গায় তুলে নিয়ে যা—"

ভৃত্যগণ প্রভুর মুখপানে চাহিল। প্রভু কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখনও তাঁহার মূর্ত্তি ভীষণ। অগত্যা তাহারা সেই মৃতপ্রায় দেহ ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া চলিল। মিঃ জেলার্ট বলিয়া দিলেন, "ওকে বাড়ীর ভেতর রেখে হৈ চৈ করিস্ না, যতক্ষণ না জ্ঞান হয় ততক্ষণ ওকে আস্তাবলের কাছে চোর কুঠরীতে শুইয়ে রাখ—খবর্দ্দার কেউ কোন গোলমাল করিস্ না!"

কেহ কোন গোলমাল করিল না; করিবার কারণও ছিল না—কেন না, ইহা ত বড় লোকের মাথাধরা নয়, ইহা যে গরীবের অন্যায় অত্যাচার-পীড়িত অভাগা দরিদ্রের জীবনসংশয় কাণ্ড।

ভৃত্যেরা নিধিকে আনিয়া নির্জ্জন আস্তাবলের ঘরে শোয়াইল। মোহন তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অপরাপর ভৃত্যগণ নিজ নিজ কাজে চলিয়া গেল। আর, নিধির স্নেহাস্পদ সহোদর খুদু, ভ্রাতার এই দুর্দ্দশার কথা কিছুই জানিতে না পারিয়া, নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল মনে বাবুর দৌহিত্রকে ঠেলাগাড়ীতে চড়াইয়া বাগানের পাশে হাওয়া খাওয়াইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টাতেও যখন নিধির জ্ঞানসঞ্চার হইল না, তখন সভাস্থল হইতে সদ্যপ্রত্যাগত উকীল বাবুর বৃদ্ধ পিতাকে মোহন সংবাদ দিল; সবজজ বাবু ঘটনার সময় নিদ্রিত ছিলেন, নিদ্রাভঙ্গে সভাস্থলে চলিয়া গিয়াছিলেন, মিঃ জেলার্টের ব্যবস্থানৈপুণ্যে কেহ

তাঁহাকে কোন কথা জানাইতে সাহসী হয় নাই ; এবং হইতও না বোধ হয়—কিন্তু ভাগ্যক্রমে জেলার্ট সাহেব তখন বাড়ীতে ছিলেন না। উকীল বাবুর বিক্ষিপ্ত মেজাজকে শান্তি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সুধরাইয়া লইবার জন্য 'ঝানু' বুদ্ধিমান্ জেলার্ট হিতৈষিতা করিয়া তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

স্বভাবতঃ ভীরু সবজজ বাবু অকস্মাৎ এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার বিবরণ শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

ম্যানেজার বিপিন বাবু জ্বরজ্বালা হওয়ার জন্য কয়দিনের ছুটি লইয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন, তিনি থাকিলে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভাবে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিতেন,—সবজজ বাবু জানিতেন, তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী পুত্রের কত কলঙ্কজনক দায়ধাক্কা, পুরাণ পাকাবুদ্ধি বিপিন বাবু নির্ব্বিবাদে সামলাইয়া লইয়াছেন। অবশ্য ধর্ম্মের নজরে তাহা অপ্রকাশ না থাকুক, কিন্তু পৃথিবীর কাকে কোকিলে তাহা ত টের পায় নাই! সুতরাং গুণবান বিপিন ম্যানেজারের জন্য আজ সবজজ বাবু অত্যন্তই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সমস্ত শক্তি সাহস লোপ হইয়া গিয়াছিল। হিসাবী বিচারবুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়াছিল। ভাল মন্দ ঠাহরাইতে না পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ পারিবারিক চিকিৎসককে বাদ দিয়া, যে কোন একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আন।

একজন ভৃত্য ছুটিল। সদ্য এম-বি পাশ করা, সহরের একজন অজ্ঞাতনামা ছোকরা ডাক্তারকে তখনই ডাকিয়া আনিল।

ইতিমধ্যে উকীল বাবু ও মিঃ জেলার্ট সাহেব হাওয়া খাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। উকীল বাবু বসিবার ঘরে গিয়া সমাগত মক্কেলগণের সহিত মামলা সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আর সবজজ বাহাদুর

জেলার্টকে ডাকিয়া লইয়া চিকিৎসকের সঙ্গে কম্পিত অবসন্ন পদে রোগীর কক্ষে ঢুকিলেন।

চিকিৎসক রোগীকে যথাযথ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কিসে এ রকমটা হল ?"

জেলার্ট অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "কিছুই না, টেবিলের কাছে বসে 'ডাষ্টার' ঝাড়ছিল, হঠাৎ বাবুর ডাক শুনে ব্যস্তভাবে যেমন উঠতে যাবে, টেবিলের কোণটা বেটক্করে সজোরে মাথায় ঠুকে যাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।"

চিকিৎসক সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, "শুধু মাথায় ত নয়, বুকেও যে বড় সাংঘাতিক আঘাত লেগেছে। ফুস্‌ফুস্ ফেটে গেছে মনে হচ্ছে যে !"

গাম্ভীর্য্যের সহিত শিক্ষাভিমানী সভ্য ভদ্রলোক জেলার্ট বলিলেন, 'আশ্চর্য্য কি ? জিনিসপত্তরশুদ্ধ টেবিলটা হুড়মুড় করে ত বুকের উপর উল্টে পড়েছে, ফুস্‌ফুস্ ফাটাই ত সম্ভব। তা ছাড়া, টেবিলের উপর থেকে আমার ভারি লোহার ডাম্বেল দুটোও একসঙ্গে ওর বুকে আছড়ে পড়েছে। আপনি যদি সে ডাম্বেল দুটোর ভার পরীক্ষা করতে চান, তাও আমি আপনাকে দেখাতে পারি।"

ডাম্বেলের গুরুত্ব-পরীক্ষাবিষয়ে কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া চিকিৎসক শুধু একবার অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে জেলার্টের মুখপানে চাহিলেন। তার পর, সবজজ বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"চৈতন্য সঞ্চার হওয়া ত দূরের কথা, জীবনের আশাই যে নাই। আপনি সিবিল সার্জ্জনকে খবর দিন, আমি একলা—"

আতঙ্কব্যাকুল দৃষ্টিতে সবজজ বাহাদুর অন্তিম-অবলম্বন জেলার্টের পানে চাহিলেন। জেলার্ট অবজ্ঞাব্যঞ্জক ঔদাস্যের সহিত বলিলেন,

"বড় অদ্ভুত কথা বলেছেন ডাক্তার। সামান্য ব্যাপারের জন্য সিবিল সার্জ্জন!"

গম্ভীরকণ্ঠে চিকিৎসক বলিলেন, "সামান্য হলে বলতুম না মশায়, ব্যাপার মারাত্মক।"

কম্পিতকণ্ঠে সবজজ বাহাদুর বলিলেন, "আপনি নিজে যেমন যা পারেন করুন, যত টাকা চান দিতে রাজী আছি, সিবিল সার্জ্জনকে ডাকবার প্রয়োজন নেই।"

"অসম্ভব মশায়। তা হলে আমায় বিদায় দিন। আমি নিজে কিছুই স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে, কোন সাহসে জীবন মরণের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেব? আচ্ছা, আপনার পারিবারিক চিকিৎসককে খবর দিন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে—"

"আচ্ছা আচ্ছা, তাঁকে বরং এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি!"—মরণান্তিক আশঙ্কার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া বৃদ্ধ সবজজ বাহাদুর হাঁপ ছাড়িয়া ত্রাসকম্পিত বক্ষে তখনই জেলার্টকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং চিকিৎসকের বাড়ীতে ছুটিলেন।

নিরুপায় ক্ষোভে মর্ম্মাহত মোহন খানসামা এতক্ষণ একপাশে দাঁড়াইয়া নীরবে সব শুনিতেছিল। জেলার্ট সাহেবের অসঙ্কোচ নিরঙ্কুশ মিথ্যা উচ্চারণের অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়া সে স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর নিধিরামের জীবনের আশা নাই শুনিয়া অনুতাপে তাহার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল। আহা, সেই ত রঙ্গ করিয়া নিধিকে নৃশংস মৃত্যুর মুখে ডাকিয়া দিয়াছিল! সে যদি নিধিকে ডাকিয়া না দিত, কিম্বা গতিক বুঝিয়া যদি বুদ্ধি খাটাইয়া প্রভুর ক্রোধের মুখ হইতে তাহাকে অন্যত্র সরাইয়া দিত, তাহা হইলে হয়ত এতখানি কাণ্ড ঘটিত না।

সবজজ বাহাদুর বাহির হইয়া গেলে, ব্যাকুলতার আবেগে দুঃসাহসী মোহন, চিকিৎসকের নিকট সমস্ত সত্য কথা খুলিয়া বলিল। তাঁহার দুইটা পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দোহাই ডাক্তার বাবু, ওকে বাঁচিয়ে দিন। ওর বুড়ো মা বাড়ীতে আছে, ছেলেমানুষ পরিবার—আহা লক্ষ্মী-ছাড়া সেদিনমাত্র বিয়ে করেছে! ওকে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে দিন!"

ডাক্তার কয় মুহূর্ত্ত কি ভাবিলেন। তার পর ক্ষুব্ধভাবে অধর দংশন করিয়া বলিলেন, "এর কে কে আছে? এর বাড়ী কোথা?"

"আজ্ঞে হুগলী জেলায় বলরামপুরে ওর বাড়ী। এই দেখুন"—মোহন নিধির ভ্রাতাকে লিখিত সেই পত্রখানি বাহির করিয়া ডাক্তারের হাতে দিয়া বলিল, "ওর বড় ভাইয়ের নাম গৌরহরি দাস, আর ওদের যে মহাজন, সে আমাদের বাবুর একজন জাঁদ্রেল মক্কেল—নাম বেহারী ঘোষ। সেও খুব নামজাদা দুঁদে লোক। তাকেও যদি একটু খবর দেওয়া যেত—"

ডাক্তার চিঠিখানা খুলিয়া তাহার উপর একবার দৃষ্টি বুলাইলেন। তার পর কোন কথা না কহিয়া সেখানা পকেটে পুরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। পনের মিনিট পরে তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন, তখনও দ্বিতীয় ডাক্তার আসিয়া পৌঁছে নাই।

অচেতন নিধির শিয়রে বিবর্ণ ম্লানবদনে উপবিষ্ট মোহনকে ডাক্তার বলিলেন, "দেখো ছোকরা, এ লোকটাকে যদি বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারা যায় ত কথাই নেই; কিন্তু এ যদি মারা যায়, তাহলে পুলিশের কাছে, আদালতে তুমি সত্য সাক্ষী দেবে?"

মোহন স্তব্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দুই মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। তার পর দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, দেব ডাক্তার বাবু, যা থাকে কুল কপালে, আমি সত্যি কথা বলব।"

"বেশ। আমি ওদের মহাজনকে টেলিগ্রাম করে এসেছি। তাকে আমি চিনি না, তবে নাম শুনেছি বটে। বেহারী ঘোষ ওর মাকে ভাইকে নিয়ে যত শীঘ্র পারে আস্‌বে। তারা এলেই পুলিশে খবর দেওয়া হবে, আপাততঃ গোলমাল কোর না।"

পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার চৌধুরীকে সঙ্গে লইয়া সবজজ বাহাদুর কক্ষে ঢুকিলেন। প্রবীণ চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করিয়া স্তিমিত নয়নে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন, "হুঁ, চোটটা বড় জবর হয়েছে। জ্ঞানটা যে আজ কালে সহজে ফিরবে তা মনে হয় না—"

যুবক ডাক্তার ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিলেন, "শুধু জ্ঞান কি, বলুন জীবনের আশাও—"

ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া সমর্থনসূচক ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তার চৌধুরী বলিলেন, "হুঁ, সে একই কথা।"

সবজজ বাহাদুর কাতরস্বরে বলিলেন, "আপনারা দুজনে মিলে রাত্রে এখানে থেকে চেষ্টা করে দেখুন, যত টাকা লাগে আমি দিতে প্রস্তুত আছি।"

বৃদ্ধ ডাক্তার গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "আহা, টাকার জন্যে কি হচ্ছে! আপনার মত ভৃত্যবৎসল মহানুভব লোক কি ভূভারতে আছে? সে ত জানি, তবে কি না—আচ্ছা দুজনে মিলে চেষ্টা করে দেখি। পরমায়ু থাকে বাঁচ্‌বে।"

সবজজ বাহাদুর বাহির হইয়া গেলে যুবক-ডাক্তার বলিলেন, "এমন গুণ্ডার মত বলিষ্ঠ লোকটার, পাথরের মত শক্ত বুক জখম হওয়ার গল্প যা শুনলেন, আপনার কি তাতে বিশ্বাস হয়?"

প্রবীণ ডাক্তারের দেহের প্রচুর রুধির এই বাড়ীর অনুকম্পাতেই সংগৃহীত হইয়াছিল, সুতরাং কৃতজ্ঞতার মর্য্যাদা একটা আছে। তবে সত্ত্ব

পাসকরা যুবকটি জল পড়ার ভূত নহে, তাহার চোখে ধূলার মুঠা ছড়াইতে গেলে উল্‌টা বিপদ বুঝিয়া, গোপন ইঙ্গিতসূচক হাস্যে ঠোঁট উল্টাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ক্ষেপেছ হে! নিত্যানন্দ রায় বিষম গোঁয়ার লোক, রাগের মাথায় কি করতে কি করে ফেলেছে—একবার একটা কোচম্যানকে চড় মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছিল, এও তেমনিতর কিছু বোধ হয়!"

"বোধ হয় নয়, যথার্থই তাই!"—যুবক ডাক্তার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা যথাশ্রুত বিবরণ করিয়া গেলেন। ডাক্তার চৌধুরী পায়ের উপর পা তুলিয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "হুঁ, সে আমি আগেই এঁচে নিয়েছি। এখন তোমার আমার পকেটে যা আসে, তাই লাভ!"

যুবক ডাক্তার ভ্রূকুটি করিয়া কষ্টে আত্মদমন পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনাকে আনিয়েছি সেই জন্যে—এ 'কেস' যখন পুলিশে যাবে তখন আপনাকে সত্যি রিপোর্ট দিতে হবে।"

বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বৃদ্ধ ডাক্তার বলিলেন, "পুলিশে মামলা দায়ের করবে কে?"

যুবক ডাক্তার মুহূর্ত্তের জন্য নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমি করব, নরহত্যার ন্যায়সঙ্গত বিচার প্রার্থনার অধিকার সকলেরই আছে—"

বৃদ্ধের মাথা পরিষ্কার হইয়া গেল,—হাওয়া কোন দিক হইতে বহিতেছে বুঝিয়া তিনি অন্তরে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ঘাড় চুলকাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "সেটা কি ভাল হয়, এত বড় ঘরটা, বুঝে কাজ কর। সামান্য একটা চাকরের জন্যে—"

কঠোর ভ্রূভঙ্গি সহ তীব্রস্বরে যুবক ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ মশায়,

সামান্য একটা চাকরের জন্তেই! দারিদ্র্যের দায়ে জঠরজ্বালায় এরা পাগল,—তাই বড় দুঃখেই আপনার আমার মত বড় লোকের স্বার্থের হাড়কাঠে মাথা গলিয়ে এরা পয়সার গোলামী করতে আসে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ওর প্রাণটাও আমাদেরই মত মানুষের প্রাণ,—আর ওর বুকটাও আমাদেরই মত রক্তে মাংসে গড়া তাজা বুক! আমাদের কাছে এ সামান্য চাকর—কিন্তু ওর গৃহে ও মাতার পুত্র, স্ত্রীর স্বামী, ভাইয়ের সহোদর!—গায়ের জোরে আসুরিক অত্যাচারে ওর টাটকা নিরেট পাঁজরা বুটের ঠোক্করে গুঁড়িয়ে দেবার অধিকার কারুর নেই,—সে জন্মদাতা পিতাই হোন, আর অন্নদাতা প্রভুই হোন!"

ডাক্তার চৌধুরী ভীতি-স্তম্ভিত নয়নে সহযোগীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। কয় মুহূর্ত্ত পরে আত্মসম্বরণ করিয়া, কাসিয়া বলিলেন—"ভায়া, বড়লোকের সঙ্গে হাঙ্গামা করা কি সহজ কথা?—সগু কলেজ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়েছ, রূপেয়া যে কি চীজ্ তা এখন বুঝছ না।—ছেলেমানুষ, রক্ত বড়ই গরম—"

যুবক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, রক্ত যেন চিরদিনই এমনি গরম থাকে, ঠাণ্ডা অসাড় কখনো না হয়। আমি যে মানুষ, সে কথা রূপেয়ার মুখ দেখে ভুলে যাবার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়।"

৫

সমস্ত দিন রাত কাটিয়া গেল, নিধির জ্ঞান হইল না। বৃদ্ধ ডাক্তার বার বার আসিয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন—যুবক ডাক্তার সমানে বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে নিধি চক্ষুরুন্মীলন করিল,—অর্দ্ধসংজ্ঞালাভে

ব্যাকুলভাবে চারিদিক চাহিয়া কষ্টে নিঃশ্বাস টানিতে টানিতে বলিল, "বাবু—বাবু কই, পোষাক কামরার চাবি—"

মোহন নিকটে ছিল, সে মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "পোষাক কামরার চাবি ধনার হেপাজতে আছে—"

নিধিরাম কষ্টে বলিল, "বাবুকে বলিস মোহন, বাবুকে বলিস—আমি মাষ্টারকে চা দিতে দেরী করিনি, তিনি বিনাদোষে আমায় মারলেন। ওঃ মোহন, বুক আমার ভেঙ্গে গেছে ভাই, আর আমি বাঁচবো না। খুদুকে—তোরা খুদুকে বাড়ী পাঠিয়ে দিস্, সে যেন আর চাকরী না করে,—"

ডাক্তার কাছে আসিয়া পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "ভয় কিহে, ভাল হয়ে যাবে তুমি। তোমাদের গাঁয়ের বেহারী ঘোষকে টেলিগ্রাম করেছি,—তিনি তোমার দাদাকে আর মাকে নিয়ে বোধ হয় আর ঘণ্টা কয়েক পরেই এসে পৌছবেন। মনে স্ফূর্ত্তি কর, মাকে স্ত্রীকে দেখলেই আরাম হয়ে যাবে।"

"আমার স্ত্রী, আমার মা!"—শঙ্কাকুলকণ্ঠে, নিধি সবেগে বলিল, "আমার মা! কেন আপনারা তাঁকে আসতে বল্লেন? কি হয়েছে আমার! আমি বাঁচবো না, নেই নেই,—কিন্তু তার জন্যে আমার মা,—না না আপনারা বারণ করুন, বাড়ীর মেয়েরা কেউ যেন এসে আমার মনিব বাড়ীতে না ঢোকে,—আমি বেঁচে থাকতে,—আমি বেঁচে থাকতে।—আমার মা, আমার মা,—আমার মনিব বাড়ীতে"—উত্তেজনাক্রান্ত নিধি হাঁপাইতে হাঁপাইতে দম বন্ধ হইয়া আবার মুর্চ্ছিত হইল,—আর জ্ঞান হইল না।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর নিধির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া আসিল। বৃদ্ধ ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "আর কি দেখব, ভোর চারটের আগেই বোধ হয় সব শেষ হয়ে যাবে।"

বৃদ্ধ ডাক্তার বিদায় লইতে উদ্যত হইলেন। সবজজ বাহাদুর সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র নয়নে দুর্গানাম জপ করিয়াছিলেন, তিনি চিকিৎসকগণের শেষ মন্তব্য শুনিয়া, একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাঁহার আদেশে মিঃ জেলাট´ চিকিৎসকদ্বয়ের পারিশ্রমিক (?) দুই সহস্র টাকার নোট লইয়া আসিয়া, রোগীর গৃহের বারান্দায় কথোপকথনরত চিকিৎসকদ্বয়ের প্রত্যেকের হাতে হাজার টাকার করিয়া গণিয়া দিলেন।

ডাক্তার চৌধুরী মামুলী ধরণের বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যের সহিত মুমূর্ষুর সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থার উপদেশ দিয়া, নোটের তাড়া পকেটে পুরিলেন। যুবক ডাক্তার শূন্য পকেটে ডান হাত পুরিয়া, বাম হাতে পুরস্কারের নোট উঁচু করিয়া ধরিয়া, খাড়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পরিষ্কার কণ্ঠে বলিলেন, "এ টাকা তা হলে আপনি আপনার তহবিলে খরচ লিখ্‌বেন কি বলে? নরহত্যা সমর্থনের উৎকোচ বলে?"

বৃদ্ধ ডাক্তার, জেলাটে´র মুখপানে চাহিলেন। কুণ্ঠিত ভাবে ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "ভায়া, অনেক খরচ করে, ছ বছর খেটে মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে এসেছ, এ রকম পাগলামো কল্লে কি মজুরী পোষাবে? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না—"

যুবক তীব্রস্বরে বলিলেন, "লক্ষ্মী মাথায় থাকুন, কিন্তু সরস্বতীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করব কোন মুখে? চিকিৎসক যখন হয়েছি, তখন চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, মানুষের কর্ত্তব্য—আমি যথাযথ পালন করতে বাধ্য।"—বলিয়া তিনি রোগীর ঘরে ঢুকিয়া হাঁসপাতালের সরকারী ডাক্তারকে পত্র লিখিতে বসিলেন।

জেলাট´ প্রমাদ গণিলেন, তিনি উর্দ্ধশ্বাসে সবজজ বাহাদুরকে সংবাদ দিতে ছুটিলেন।

'ঘড়্‌ ঘড়্‌' শব্দে এই সময় একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী আসিয়া সদর

দেউড়ীতে ঢুকিল। একজন পল্লীগ্রামের ভদ্রলোকের সহিত একটি যুবক ও একজন বিধবা স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিলেন। মোহন বলিয়া উঠিল, "ঐ—ঐ—বেহারী ঘোষ আর ঐ বোধ হয় নিধির মা আর ভাই।"

ডাক্তার কলম ফেলিয়া উঠিয়া অগ্রসর হইয়া বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "গোলমাল কোর না, আস্তে এস।"

নিধির দাদা গৌর,—মাতাকে ধরিয়া ধরিয়া লইয়া আসিল। ডাক্তার বাবুর প্রেরিত লোক পূর্ব্বেই ষ্টেশনে গিয়া তাহাদের সমস্ত বিবরণ জানাইয়াছিল। অশ্রুবর্ষণনিরতা জননী পুত্রের মুখের কাছে বসিয়া আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "নিধি, বাপ আমার!"

"প্রবেশ নিষেধ" আজ্ঞা প্রাপ্ত খুদু এতক্ষণ অন্যত্র আটক থাকিয়া উদ্বেগে ছট্‌ফট্ করিতেছিল। এইবার সকলের শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া রোগীর ঘরে ঢুকিল; নিধির দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, "দাদা, ওগো মেজদাদা, মা তোমায় দেখতে এসেছে, একবার চোখ মেলে চাও!"

নিধির তখন বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিশ্রাম জলধারা গড়াইতেছিল। বোধ হয় ভিতরে তখন সজ্ঞানে সে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতেছিল। মাতা ও ভ্রাতার ক্রন্দনে সে অতি কষ্টে চক্ষু মেলিল, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারিল না। অর্দ্ধবিস্ফারিত চক্ষে মাতার পাশে একবার যেন কাহার অনুসন্ধান করিল,—তার পর বোধ হয়, কেহ নাই দেখিয়া আশ্বস্তভাবে সজোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া ধুলায় লুটাইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

যুবক ডাক্তার উপস্থিত কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়া বৃদ্ধ সহযোগীকে

খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন, গোলমালে তিনি কখন নিঃশব্দে প্রস্থান করিয়াছেন। মর্ম্মান্তিক আক্ষেপে সজোরে অধর দংশন করিয়া ডাক্তার মুহূর্ত্তের জন্য কি ভাবিলেন। তার পর বেহারী ঘোষের হাত ধরিয়া গৃহের বাহিরে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "মশাই, যে লোকটা মারা গেল তাদের গ্রামের আপনি একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক, আপনার কি উচিত নয় এই নৃশংস হত্যার বিরুদ্ধে কিছু—"

বেহারী ঘোষ সত্রাসে জিভ কাটিয়া বলিলেন, "বাপরে,—উকীলবাবু, আমাদের মা বাপ, ওঁর বিরুদ্ধে কি আধখানা কথা কইতে পারি!"

"স্বার্থের খাতিরে অন্যায় অত্যাচারের শাসনও এমন পূজনীয়!—ধন্যবাদ মশায়,"—ডাক্তার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, নতশিরে অশ্রুমোচনরত গৌরকে বলিলেন, "কি হে, তোমার ত সহোদর, তুমিও কি এই ভদ্র-লোকের মত—"

সদ্য-শোকাহত গৌর, কাতরকণ্ঠে বলিল, "মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেবেন না মশাই! আমরা খেতে পাইনে, দেনার দায়ে কাবু হয়ে রয়েছি। বড় আশায় ভাইকে চাকরী করতে পাঠিয়েছিলাম,—এবার ধনে প্রাণে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। আর কোন কথা বলবেন না। ভাই ত আমার আর ফিরবে না, অনর্থক জীয়ন্ত যমের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে আর কি করব? আর, মামলা-খরচই-বা পাব কোথা?"

"আমি দেব। আমার পারিশ্রমিক হাজার টাকা এখনি দিতে রাজি আছি, দেখো, পুলীশে খবর দিই—"

কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিয়া সবজজ বাহাদুর ডাক্তারের দুই হাত ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিলেন,—"দোহাই ডাক্তার, মাপ কর, আমি বুড়ো বাপ আছি,—এ বয়সে আমার সর্ব্বনাশ কোর না।—যা হয়েছে, ফিরবে না ডাক্তার; তোমার পায়ে ধরছি ক্ষমা কর। তোমার স্বর্গীয় পিতার

কথা মনে কর। আমি বৃদ্ধ, আমার মিনতি রাখ। সন্তানের দুষ্কৃতি পিতার পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রণা। আমি যথেষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করেছি,—দোহাই তোমার, আর—"

ডাক্তার মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইলেন। তারপর স্থিরস্বরে বলিলেন, "আপনি ন্যায়ের দণ্ড হাতে করে, আজীবন বিচারাসনে বসে কাটিয়েছেন, আপনিও স্বার্থের খাতিরে নিজের মুখ চেয়ে, পুত্র বলে নরহন্তাকে ক্ষমা করে অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছেন? ভাল!—আপনি বৃদ্ধ, আমার পিতৃতুল্য মাননীয়, আপনাকে কোন কথা বল্‌তে ইচ্ছা করিনে। কিন্তু আমার পিতার স্মৃতি যখন স্মরণ করালেন, তখন একটা কথা বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি। আমার পিতাও আপনার মত একজন বিচারক ছিলেন; আজ তিনি যদি জীবিত থাকতেন, আর আমি যদি এমনিভাবে প্রভুত্বমদগর্ব্বে অন্যায় অত্যাচারে একটা নরহত্যা করতাম, তা হলে আমার ন্যায়-বিচারক পিতা আজ আমার ন্যায্য বিচারে ফাঁসি দিতে একটুকুও ইতস্ততঃ করতেন না।—আজ সেই বিজ্ঞ বিচারকের—আমার স্বর্গীয় পিতার চরিত্রমহত্ব স্মরণ করে,— তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য, আপনার মত পিতার অন্ধস্নেহের অন্যায় অনুজ্ঞা বহনে আমি স্বীকৃত হলাম।—আপনি স্থির হোন, কিন্তু স্মরণ রাখ্‌বেন মশায়, নরহন্তার বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ সম্মান গৌরবের মর্য্যাদা অন্যে নতশিরে বহন করতে পারবে, কিন্তু আমার পিতৃশোণিত যার দেহে বিদ্যমান আছে, সে তাতে চিরদিন ঘৃণাভরে পদাঘাত করবে!—"

এই বলিয়া ডাক্তার নোটের তাড়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

গৌর আড়ষ্ট নির্জ্জীবের মত বসিয়াছিল। বেহারী ঘোষ তাহার হাত ধরিয়া, মুহ্যমান সবজজ বাহাদুরের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়া বিজ্ঞতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, যা হয়ে বয়ে গেছে, তা ফিরবে

না,—কেন অনর্থক দুঃখ? আপনারা কিছু মনে করবেন না। নিধি গেছে, নিধির ভাই আছে। এরা আপনার গোলামী করে জীবন কাটাবে। কি বলহে গৌর, মহতের আশ্রয়—আর দেনাটাও ত শোধ করতে হবে……”

সহসা কি যেন আতঙ্কের বিভীষিকায় সবজজ বাহাদুর পিছু হটিয়া বলিলেন, “না না, আমিই তোমার দেনা শোধ করব বাপু; কিন্তু ওদের কারুর মুখ আর দেখতে পারব না।—ডাক্তারের ফিজের এই নোটগুলো বরং ওদেরই দাও।……আমি আর এখানে দাঁড়াতে পারব না”…সবজজ বাহাদুর স্খলিতচরণে টলিতে টলিতে প্রস্থান করিলেন।

নিধির মাতা গৃহমধ্যে আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন। উপরতলা হইতে মিঃ জেলার্ট হাঁকিয়া বলিলেন, “এইও ড্যারোয়ান, উ লোককো বেয়াদবীসে চিল্লানে দেও মৎ,—উকীল বাবুকে, নিদ্ টুট্ যাতা হ্যায়।”

ডাক্তার তখন গেটের বাহিরে গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছিলেন। মিঃ জেলার্টের গর্ব্বিত কণ্ঠের উচ্চ চীৎকার কানে পৌঁছিতেই, তিনি দাঁড়াইলেন। মুখ ফিরাইয়া একবার সেই সাহেবী পোষাক পরিহিত কৃষ্ণাঙ্গের দাসত্বগৌরবের দর্পমণ্ডিত বদনের উচ্চ দীর্ঘ দন্তবিকাশ দেখিলেন, একবার সেই অমরাবতীনিন্দিত, উজ্জ্বল আলোকমালা-সজ্জিত প্রকাণ্ড পুরীর দিকে চাহিলেন,—তারপর সজোরে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া, গাড়ীতে উঠিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

———

কর্পূরের মালা।

১

গোলমালে ভিড়ের ভিতর মাসীমার হাত ছাড়াইয়া ছবি যে কখন পিছাইয়া পড়িয়াছিল তাহা সে কিছুই টের পায় নাই, হঠাৎ অপরিচিত লোকের ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি মাঝে আপনাকে নিঃসহায় বেপথুমানা দেখিয়া ভয়ে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

দোলযাত্রা উপলক্ষে সেদিন জগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দিরে লোকে লোকারণ্য। সকলেই কনুইয়ের ধাক্কায় লোক হটাইয়া অগ্রসর হইতে উদ্‌গ্রীব। যাত্রী-পরিচালক পাণ্ডা ও ছড়িদারদের হাঁকডাকে কানে তালা ধরিয়া যাইতেছে। ত্রয়োদশবর্ষীয়া পাৎলা ডিগ্‌ডিগে মেয়ে ছবি—লোকের হুড়াহুড়ির ঠেলায় পিছু হটিতে হটিতে একেবারে মন্দিরের দরজার গোড়ায় আসিয়া পৌঁছিল।

ছবি আকুলক্রন্দনে অধীর হইয়া উঠিল। কে কাহাকে দেখে, কে কাহার কথা শোনে? তাহার পানে কেহ ফিরিয়া তাকাইলও না।—আজ দেবতা দর্শনে তাহারা আসিয়াছে—দেবতা দেখিবে, দুঃস্থকে দেখিবার অবকাশ নাই; দেবতার দর্শনে স্বর্গলাভ হয়,—সে স্বর্গ যদি বাহুবলের প্রভাবে, গুঁতাগুঁতির দ্বারা দুর্ব্বল দলনে পাওয়া যায়, তবে কোন্ বুদ্ধিমান তাহাতে ইতস্ততঃ করে? কে এমন স্বার্থত্যাগী নির্ব্বোধ আছে, নির্লজ্জ আছে, যে পরের খোঁজ লইতে গিয়া নিজের অনায়াসলভ্য স্বর্গ হারাইতে আপত্তি করে না? কেহই না!—আতঙ্ক-পীড়িতা বালিকার ক্ষীণরোদন প্রচণ্ড কোলাহলের মাঝে ডুবিয়া তলাইয়া গেল।

"কি হয়েছে খুকি, কি হয়েছে তোমার—কেন কাঁদছ গা?" শ্যামবর্ণ,

একহারা, কপালে চন্দনের ফোঁটা গলায় মালা, কোমরে গামছা জড়ান, ঈষদ্দীর্ঘাকৃতি একটি তরুণ কোমলমূর্ত্তি, ছবির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্নেহময় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কাঁদছ খুকি ?—" চারিদিকে অদ্ভুত বৈচিত্র্যময়ী কটকীভাষার কিড়িমিড়ির মাঝে, হঠাৎ পরিষ্কার বাংলা প্রশ্ন শুনিয়া ছবির কান্না বন্ধ হইল; ছবি জলভরা বড় বড় চোক দুটি তুলিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্নকর্ত্তার মুখপানে চাহিল, আহা কি সুন্দর মমতাময় সরল মুখখানি! সন্ত্র শঙ্কিতা ছবি অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

আবার স্নেহময় স্বরে সেই ব্যগ্রপ্রশ্ন—।

সহসা পিছনের সজোর ধাক্কায়, সোলার পুতুলের মত ক্ষীণকায়া ছবি, ছিট্‌কাইয়া সেই লোকটির উপর গিয়া পড়িল,—ক্ষিপ্রহস্তে পতনোন্মুখ ছবিকে ধরিয়া ফেলিয়া সেই লোকটি অতি যত্নে তাহাকে বাম হাতের বেষ্টনে আগ্‌লাইয়া লইয়া, বিপুল বিক্রমে দক্ষিণ হস্তের অমিত প্রতাপে লোক ঠেলিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটু তফাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

ছবি এতক্ষণ প্রাণপণে অন্তিম অবলম্বনের মত সেই অপরিচিত লোকটির হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল। এখন ফাঁকা জায়গায় আসিয়া সঘন উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া, লোকটির হস্তবদ্ধ নিজের ঘর্ম্মাক্ত হাতখানি খুলিয়া লইয়া সলজ্জ সঙ্কোচে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। লাবণ্যময়ী কিশোরীর মুখপানে প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, তরুণ যুবাটি করুণা-কোমল কণ্ঠে সুধাইল, "কার সঙ্গে মন্দিরে এসেছিলে খুকি ?"

থামিয়া থামিয়া শুষ্ক কণ্ঠে ছবি বলিল, "আমার মা, মাসীমা, মেশো-মশাই, ঝি—সবাই এসেছে। আমি মাসীমার হাত ধরেছিলুম, তার পর মন্দিরে ঢুকে—" ছবি আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

"চুপ কর, চুপ কর, এখনি তাদের পাবে, কান্না কি ? তোমাদের ছড়িদার কেউ নেই ?"

"হ্যাঁ আছে, কপালে ফোঁটা পরে একজন-

"তার নাম কি বল দেখি ?"

"তা জানিনে, তার মাথায়,—ঐ তোমার মত চুল ছাঁটা নেই ত,—বড় বড় চুলে চূড়ো বাঁধা আছে।"

সরলা বালিকার এই অভ্রান্ত যুক্তিপূর্ণ অভিজ্ঞান নির্দ্দেশে লোকটির মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল; চারিদিকেই তো শত শত চূড়া-বাঁধা মাথা, তাহার মধ্য হইতে একটি চূড়া-চিহ্নিত পরিচিত মাথা খুঁজিয়া বাহির করা নিতান্তই সহজ!

"আচ্ছা পাণ্ডার নাম কি জান ?"

"না, মায়েরা কেবল সেই লোকটার সঙ্গেই ঠাকুর দেখ্‌তে ঢুকেছেন।"

"মন্দিরে ঢুকেছেন তো? আচ্ছা, তবে কোন ভয় নেই, এখনি বেরুলেই পাওয়া যাবে। তোমার নামটি কি খুকি ?"

"আমার নাম ছবি।"

সেই রবিকরোজ্জ্বল মধুর প্রভাতে সেই স্নিগ্ধ লালিত্যময় সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ-হৃদয় যুবা ভাবিল "ছবি বটে!"

কোলাহল করিতে করিতে যাত্রিদল জলপ্রবাহবৎ যাওয়া আসা করিতেছে! চলিতে চলিতে কেহ বা তাহাদের দিকে কৌতুকোজ্জ্বল কটাক্ষ হানিয়া যাইতেছিল,—ছবি নতদৃষ্টিতে সসঙ্কোচে জড়সড় হইতেছিল। অদূরে আবির-লাঞ্ছিত অদ্ভুতদৃশ্য কয়েকজন ছোকরা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া, গোপন বিদ্রূপে চোখ টেপাটেপি করিয়া বেজায় হাসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন দণ্ড দুয়েকের জন্য সরিয়া গিয়া মন্দিরদ্বারে ভিড়ে মিশিল, তার পর সহসা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আসিয়া আচম্বিতে ছবির হাত ধরিয়া এক হ্যাঁচকা মারিল। "আরে আমার যাত্রীর মেয়ে ভিড়ে হারিয়েছে, আয়!"

সেই সর্ব্বদর্শী তরুণ যুবা এই লোকটার আচরণ আগাগোড়া সব লক্ষ্য করিতেছিল; বহুকষ্টে এতক্ষণ সংযত ছিল, আর পারিল না, সদ্যকৃত ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তরে অকস্মাৎ রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া সেই অসভ্যটার গালে সশব্দে এক চড় বসাইয়া দিল, "বিশ্বম্ভর পাণ্ডার হাতে-গড়া চেলা, ছড়িদারদের সর্দ্দার সে,—রঞ্জনমিশ্র তার নাম, তার কাছে বেয়াদবি !"

অপ্রত্যাশিত চপেটাঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া আলোড়িত মস্তিষ্কে বুদ্ধিমান্ লোকটা যন্ত্রণাকাতর মুখে গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাড়াতাড়ি ভিড়ে ভিড়িয়া পড়িল, আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না। ভয়াকুলা ছবিকে শান্তস্বরে আশ্বস্ত করিয়া রঞ্জন তাহাকে আবার আগলাইয়া দাঁড়াইল।

"মেয়ে কই, মেয়ে কই"—কোলাহল করিতে করিতে একদল লোক মন্দির হইতে বাহির হইয়া ব্যগ্র ব্যস্ততায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।—"ওগো এইদিকে একটি মেয়ে দেখেছ গা,—এই এতটুকু মেয়ে—পাৎলা চেহারা সুন্দর মতন, কেউ দেখেছ গা—"

চারিদিকে প্রশ্নোত্তরের উচ্ছৃঙ্খল কলরব পড়িয়া গেল!

"আরে এই হরুয়া—এই, এই ধারে ফের, আরে—এই বোকা এ দিকে দেখ, এই কি খুঁজছিস্—"

"আরে মেয়ে হারিয়েছে; মেয়ে হারিয়েছে, আমার যাত্রীর।"

"দেখ দেখি এই কি সেই ?"—

"হাঁ হাঁ, এই এই!—ভয় নেই বাবু, পাওয়া গেছে, এই দিকে এই দিকে আসুন আসুন,—এই যে গো এই!"

ভয়ঙ্কর ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির ভারি ধুম পড়িয়া গেল, কে কাহার ঘাড়ে পড়ে,—ঠিক নাই। অনেক লোক ছুটিয়া আসিয়া রঞ্জন ও ছবিকে ঘিরিয়া ফেলিল, রোরুদ্যমানা আকুলা বিধবা জননী ছবিকে কোলের কাছে

টানিয়া লইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। সদ্য-আশঙ্কা-মুক্ত আশ্বস্ত অন্তরে জগবন্ধুর উদ্দেশে তাঁহার চক্ষু হইতে পূর্ণ আবেগে অশ্রু উছলিয়া পড়িতে লাগিল!—

২

তাহার পর দিনকয়েকের মধ্যেই সেই পরিবারের সহিত অপরিচিত যুবার ঘনিষ্ঠতা খুব পাকাপাকি হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেটা সকলের প্রীতিকর হইল না। সংসারে এক শ্রেণীর কতকগুলি জীব আছে, যাহারা নিজেরাও হাসিতে পারে না, আর পরের হাসিও সহ্য করিতে পারে না। গোপন অন্ধকারে, ব্যর্থ ঈর্ষাকে ক্রমাগত কঠিন বিদ্বেষে শানাইয়া বড়ই তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল করা যায়; কিন্তু সেটা যে কেবল পরের চর্ম্মই ভেদ করিবে,—এমন কথা নিঃসংশয়ে কেহ বলিতে পারে না, বরং সেটা বিপরীত মুখে প্রক্ষিপ্ত হইয়া অনেক সময় একে আর হইয়া দাঁড়ায়, এবং যন্ত্রণার ঝালটা বাড়িতে থাকে সেই লক্ষ্যচ্যুত পরের উপর।—

দুষ্ট গ্রহের অনুকম্পায় রঞ্জনের সেইরূপ কতকগুলি সুহৃদ জুটিল। পাণ্ডার ছড়িদারেরা তাহার উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল; বাস্তবিক এত উচ্ছৃঙ্খলতা কি সহ্য করিতে পারা যায়? কোথাকার কে,—সম্পূর্ণ অপরিচিত, অনাহূত, অন্য পাণ্ডার এক লক্ষ্মীছাড়া ছড়িদার—সে লোকটা সহসা অতর্কিতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া তাহাদের একান্ত ইজারা-করা যাত্রী-পরিবারকে ছোঁ মারিয়া যে অসঙ্কোচে নিজের খাস দখলের অন্তর্ভূত করিয়া লইবে,—ইহা কখনই কোন সহিষ্ণু ব্যক্তি ক্ষমা করিতে পারে না! আর রঞ্জনের উপরই বা ইহাদের এত টান কেন রে বাপু! ছোঁড়া যাদু জানে না কি?—

বাস্তবিকই, সরল হাস্যমণ্ডিত মুখে এই প্রিয়দর্শন যুবাটি যাহার কাছে

গিয়া দাঁড়াইত তাহারই প্রাণে একটা স্নিগ্ধ মাধুরী ফুটাইয়া তুলিত; রমণীরা ছলছল নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া ভাবিতেন, আহা ছেলেটি কি মায়াবী; পুরুষেরা ভাবিত আরামের সঙ্গী বটে। দরিদ্রের প্রতি চিরতাচ্ছিল্যশালী ক্রূর দাম্ভিক অন্তঃকরণও এই আত্মসম্ভ্রমে উদাসী সুকোমলকান্তি যুবাটির নম্র সরলতায় অকপট স্নিগ্ধতায় চমৎকৃত হইত। রঞ্জন কাহারো খাতির রাখিত না, নিজেও খাতিরের জন্য লালায়িত ছিল না, কিন্তু সকলের উপরই তাহার অগাধ অপরিসীম ভালবাসা! রঞ্জনের একটা মহৎ গুণ ছিল, সে সকলের সঙ্গেই অবাধে মানাইয়া চলিত, কখনো কোথাও দ্বিধাপীড়িত হইয়া কেহ তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখে নাই। সকল হৃদয়ের সঙ্গেই সে সমানভাবেই হৃদয় মিশাইতে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু কোথাও এতটুকু অসংযম বর্ব্বরতার চিহ্ন ছিল না। নিজেদের ত্রুটি যাহারা সংশোধন করিতে জানে না, এবং পরের নৈপুণ্য সহ্য করাও যাহাদের ক্ষমতার অতীত, তাহাদের মত লোকের চক্ষুঃশূল ছিল রঞ্জন! কিন্তু উন্মুক্ত-উদার-প্রাণ রঞ্জনের তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না; সে প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রোশের আক্রমণ কৌতুকের হাসিতে নিষ্ফল করিয়া শত্রুকে অমায়িক ব্যবহারে অভিভূত করিয়া ফেলিত। তাহাকে যে অপদস্থ করিতে আসিত,—সেই অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিত।

অবসরে অনবসরে রঞ্জন মেসো-মহাশয়ের অন্তরঙ্গ সহচর হইয়া উঠিল। শ্রীমন্দিরে বিগ্রহদর্শনের সময় তাঁহাদের নিজ পাণ্ডার ছড়িদার থাকা সত্ত্বেও তিনি রঞ্জনকে টানিয়া আনিতেন। সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে হইবে, তাও রঞ্জন সঙ্গী। রাত্রে বাসায় বসিয়া গল্প গুজব করিবেন, তাহাতেও প্রায় রঞ্জনই রঙ্গদার থাকিবে। দূরে দেবদর্শনে যাইতে হইবে, সেও রঞ্জন সঙ্গে থাকিলেই ভাল হয়। না হইলে মেসো-মশায়ের একান্ত অস্বস্তি বোধ হয়। সকল বিষয়েই রঞ্জন হইয়াছিল তাঁহার প্রধান নির্ভর!

নিজের প্রভুর কাজ বাজাইয়া এতটুকু অবসর পাইলেই রঞ্জন আসিয়া তাঁহার কাছে জুটিত। তাঁহাদের সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাদের সব দেখাইয়া শুনাইয়া, কে জানে কেন,—রঞ্জন এক অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তি পাইত। বিশেষ ছবি।—আহা ছবিটি বেশ মেয়ে, ছবির কমনীয় ছবিখানি দেখিবার জন্য তাহার প্রাণে সযত্নে লুক্কায়িত একটা অপরিসীম আগ্রহ সঞ্চিত ছিল; তাহার প্রাবল্যে রঞ্জন একটু বেশ রীতিমতই বিব্রত হইয়াছিল। ছবির নিকট হইতে সে ইদানি সতর্কতার সহিত তফাতে থাকিতে চাহিত। প্রাণপণে আত্মদমন করিয়া সকলের নিকট চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত স্বভাবসিদ্ধ সহজস্বরে দিব্য কথাবার্ত্তা কহিত, কিন্তু এতটুকু ছোট মেয়ে,— সে সকলের নিতান্ত অগ্রাহ্যের বস্তু—তাহার কাছে রঞ্জনের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া হঠাৎ সব গোলমাল হইয়া যাইত। হাসিভরা মুখের সুধাভরা বাক্যগুলা অকস্মাৎ নির্ম্মম সঙ্কোচে পরস্পর আত্মঘাতী হইয়া মরিত। সকলের মুখপানে সে অসঙ্কোচে চাহিত, কিন্তু যদি দৈবাৎ অতর্কিতে ছবির সহিত চোখোচোখী হইত তবে সে আকুল উৎকণ্ঠায়, ত্রস্তে চোখ নামাইয়া, কোনমতে সেখান হইতে সরিয়া যাইতে পারিলে তবে হাঁফ ছাড়িয়া সুস্থ হইত; কিন্তু কে জানে কি একটা তীব্র আকর্ষণ তাহাকে ক্রমাগতই সেই দিকে টানিত।

পনের বছর বয়স হইতে সে যাত্রী চরাইতেছে, কিন্তু কই তাহার তো কাহারও কাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কোচ হয় নাই। এখন তবে একি হইতেছে? এতটুকু একজনের কাছে এত কিসের.........।

নিজের গতিক বুঝিয়া সে নিজেই ধাঁধায় পড়িয়া গেল, একি হইল।—

৩

বিকালে, বাসার বারান্দায় পৈঠার উপর বসিয়া ছুরি দিয়া মেসো-মশাই কাঁচা আম ছাড়াইতেছেন ও অদূরবর্ত্তী রোয়াকে উপবিষ্টা, হরিনামের ঝুলি হস্তে, ছবির জননীর সহিত ছবির বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। খিড়্‌কির পশ্চাদ্ভাগে পোড়ো জমীটায় ছেলেরা সকলে খেলা করিতেছিল। সেখান হইতে তাহাদের উচ্চ কলরব বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল, অন্য স্ত্রীলোকেরা তখন রান্নাঘরে ছিলেন।

সদর দুয়ার পার হইয়া প্রাঙ্গণে রঞ্জন মিশ্র দেখা দিল। মুহূর্ত্তে মেসো-মহাশয়ের মুখের কথা ঠোঁটের মধ্যে থামিয়া গেল, হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলিলেন, "এস এস রঞ্জন এস, কাল তোমায় দেখ্‌তে পাইনি কেন ঠাকুর?"

"বড় কাজের ভিড় পড়েছে বাবু। ওকি কচ্ছেন? আম? দিন আমায় আমি ছাড়াচ্ছি"—মেসোমহাশয়ের হাত হইতে ছুরি লইয়া রঞ্জন তৎক্ষণাৎ আম ছাড়াইতে বসিয়া পড়িল। সস্নেহ দৃষ্টিতে একবার তাহার পানে তাকাইয়া মেসোমশাই আবার ছবির বিবাহের প্রসঙ্গ লইয়া পড়িলেন।

রঞ্জনের শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর শরীরের সমস্ত তড়িৎ আসিয়া কাজ করিতে লাগিল। প্রাণপণে উত্তেজনা চাপিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে ছুরি চালাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রঞ্জন সব আমগুলি পরিষ্কাররূপে ছাড়াইয়া ফেলিল, "দেখুন তো বাবু হয়েছে?"

"বেশ হয়েছে। আচ্ছা রঞ্জন, তুমি এত বাংলা শিখ্‌লে কোথা? কখনো বাংলা দেশে গিছ্‌লে?"

"না বাবু, এইখানেই যাত্রীদের সঙ্গে মিশে শিখেছি।"

"বাঃ! বাহাদুর ছেলে তুমি, খাসা বুদ্ধিমান!"

রঞ্জন উপস্থিত কৌতুকে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বালকের

মত অসঙ্কোচ আনন্দ-সুন্দর দৃষ্টিতে মেসোমশায়ের পানে তাকাইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "আপনারা আমায় বড় ভালবাসেন। না ?"

তাহার সুকোমল সরল প্রশ্নে ছবির জননীর মনে গভীর মমতার উৎস উথলিয়া উঠিল; জীবনের সহস্র শোক বেদনায় সন্তপ্তা রমণীর চক্ষু হইতে বাৎসল্য-স্নেহের তপ্ত অশ্রু খসিয়া পড়িতেই তাড়াতাড়ি আঁচলে চক্ষু মুছিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "নারায়ণ, নারায়ণ, হরিবোল!" মেসো-মশাই সস্নেহে রঞ্জনের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে রহস্যস্মিতহাস্যে বলিলেন, "ঠিক হয়েছে দিদি, আপনি ছবির বের জন্যে ভাব্ছেন কেন? এক কাজ করুন,—জগবন্ধুর সামনে দুটো ফুল ফেলে, ছবিকে এই ছেলেটির হাতে উচ্ছুগ্যু করে দিন, ভাবনা চিন্তে সব চুকুক্, আর রঞ্জনটিও আমাদের আপনার লোক হয়ে যাক্।"

রঞ্জনের কপালের শিরা লাফাইয়া ফুলিয়া উঠিল। আঘাতের ধাক্কাটা অবিচলিত ভাবে গোপন করিতে, তাড়াতাড়ি অঞ্জলি পুরিয়া আম লইয়া রঞ্জন রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। সজল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া ছবির জননী ভাবিলেন "আহা অমন আস্থি-সো জামাই হওয়া ভাগ্যের কথা!"

রঞ্জন ফিরিয়া আসিয়া বসিল, অন্য প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কিন্তু রঞ্জন সে সকল কথা আর শুনিতে পাইল না। তাহার উদ্যত আনন্দফুল্ল শ্রবণশক্তি—সহসা কালান্তকের শরবিদ্ধ মুমূর্ষুর মত প্রাণের মাঝে লুকাইয়া পড়িল। হায় অশুভক্ষণে সেই তুচ্ছ ব্যঙ্গ উচ্চারিত হইয়াছিল —রঞ্জনের অন্তরে সেটা সাংঘাতিক বাজিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া রঞ্জন কেবলই অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কঠিন পৌরুষের তীব্র ভ্রূকুটী-ভঙ্গিমায় যতই সেই মোহময় উদ্বেগটাকে সজোরে ধাক্কা মারিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল ব্যাপারটা ততই দৃঢ় হইয়া তাহার অন্তরে প্রতিঘাত করিতে লাগিল। কি বিপদ!—রঞ্জন আকুল হইয়া উঠিল। কথাটা

ক্রমশঃ তাহার সমস্ত মনটা জুড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। কোন রকমে শিষ্টাচার বজায় রাখিয়া বিদায় লইয়া রঞ্জন খিড়্কির দুয়ার দিয়া বাহির হইল। সুবিধা হইত বলিয়া সে এই পথ দিয়াই প্রায় বাটী যাইত।

খিড়কির বাহিরে, খোলা জমীতে, বালির গণ্ডী কাটিয়া মহা উৎসাহ আস্ফালনে ছেলেরা সব খেলায় মাতিয়াছে। কেবল ছবি একাকী, ওদিকের রাস্তার ধারে বেড়ার কাছে দাঁড়াইয়া, একজন উড়িয়া স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছিল। ছবি বড় হইয়াছে, সে কি আর খেলিতে পারে? —ছিঃ! তাহার কাজ এখন সকলকে আটকাইয়া খেলা করান।

রঞ্জনের পা আর সরিল না, চিত্রার্পিতের মত দুয়ার অবলম্বনে দাঁড়াইয়া আত্মবিস্মৃত রঞ্জন গভীর বিহ্বলতায় ছবির পানে চাহিয়া রহিল—আহা কি চমৎকার ছবিটি! রঞ্জনের মস্তিষ্কে ঘনীভূত উত্তেজনা জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

ছবি স্ত্রীলোকটিকে আত্ম-পরিচয় দিতেছে, "আমার সবাই আছে, কেবল বাবা নাই।"

কথাটা রঞ্জনের মর্ম্মভেদ করিয়া ধ্যানস্থ হৃদয়ের সমবেদনার তারে সূক্ষ্ম আঘাতে গভীর করুণার আকুল ঝঞ্ঝনা বাজাইয়া তুলিল!—আহা তাহারো যে পিতা নাই!

সহসা তাহার স্বপ্নপূর্ণ চিত্ত আলোড়িত করিয়া তীব্র গ্লানির ধিক্কারে ক্ষণমধ্যে তাহার সহানুভূতিপূর্ণ সুখের আবেশে রচিত চিন্তা-গ্রন্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ক্ষুব্ধতাক্ষিপ্ত প্রাণ নিষ্করুণ যন্ত্রণায় হাহাকার করিয়া উঠিল হায় হায় সে করিতেছে কি?—করিতেছে কি! ভগবান জগন্নাথ দেব, তোমার আশ্রিত অনুগত সেবকের অন্তরে একি প্রলয়ঙ্কর প্রলোভন-ময় আকাঙ্ক্ষার দাবানল প্রজ্বলিত করিলে ঠাকুর!—রক্ষা কর রক্ষা কর প্রভু!

মাতালের মত টলিতে টলিতে রঞ্জন পথে নাবিয়া পড়িল।

৪

পরদিন শ্রীমন্দিরে মেসো-মশায়ের সহিত রঞ্জনের দেখা হইল। সকলকে লইয়া তিনি দেবতা দর্শনে আসিয়াছেন। রঞ্জনকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আজ একবার ভাল করে দর্শন করিয়ে দাও, আজই তো শেষ, আর ত হবে না।"

"হবে না। কেন বাবু?"

"কাল যে আমরা দেশে ফিরব, ঠাকুর।"

নিমেষ-মধ্যে কে যেন রঞ্জনের হৃদ্‌পিণ্ডের শিরাগুলি তপ্ত সাঁড়াশীতে সজোরে চিম্‌টাইয়া ধরিল, কাল!—কালই—এত শীঘ্র! পীড়িত মর্ম্ম ভেদ করিয়া, বুকের মাঝখানে, বার বার আর্ত্তপ্রশ্ন ধ্বনিত হইতে লাগিল—কাল, কালই, এত শীঘ্র! হায় দুর্ভাগ্য!

কোমরে কসিয়া চাদর বাঁধিয়া, সজোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রঞ্জন মনে মনে ভাবিল "আমারই অন্যায়!"

"আবার কবে আসবেন বাবু!"

"আবার!"—রহস্যচ্ছলে হাসিয়া মেসোমশাই বলিলেন, "জগন্নাথ আবার যখন ডুরি ধরে টান্‌বেন্ তখন আস্‌ব, কি বলেন দিদি?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া ছবির জননী মন্দির-পানে চাহিয়া বলিলেন, "আহা তা আর নয়! জগবন্ধু আবার যখন মনে কর্‌বেন, তখন আস্‌ব।"

ম্লানমুখে ক্লিষ্টহাসি হাসিয়া রঞ্জন বলিল, "তিনি সবাইকে মনে করেন মা, কিন্তু তাঁকে তো সবাইকার মনে পড়ে না!"

মেসোমশাই গম্ভীর মুখে বলিলেন, "ঠিক্।"

"তা হলে সবাইকে নিয়ে রথের সময় আস্‌বেন বাবু।" কথাটা বলিয়াই দুঃসহ কুণ্ঠা রঞ্জনের কণ্ঠ যেন চাপিয়া ধরিল, রঞ্জন তাড়াতাড়ি

সকলকে লইয়া অগ্রসর হইল। চলিতে চলিতে মেসোমশাই বলিলেন, "রঞ্জন তুমি আজ বিকালে আমাদের বাসায় যাবে?"

"না বাবু, পাণ্ডার জরুরী কাজ আছে।"

"তাইত তোমার সঙ্গে যে তা হলে আর দেখা হবে না, আমরা কাল সকালের ট্রেনেই যে রওনা হব।"

ব্যস্তভাবে ছবির জননী বলিলেন, "তা হলে এইখানেই—"

"হ্যাঁ তাই হবে।"

সকলে মন্দিরে ঢুকিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলে মন্দিরপ্রাঙ্গণে আবার সমবেত হইলেন। অকস্মাৎ-দৃষ্ট একটি পরিচিত লোকের সহিত মেসোমহাশয় একটু তফাতে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন দেখিয়া রঞ্জনও অন্যদিকে সরিয়া গেল, কয়েক ছড়া কর্পূরের মালা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ভাবিতেছিল। মর্ম্মান্তিক কাতরতায় তাহার সারা অন্তঃকরণটা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। হায় কাল হইতে সে আর ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে না!

খানিক পরে মেসো-মশাই ফিরিলেন। রঞ্জন আসিয়া মেসোমশায়ের গলায় একছড়া মালা পরাইয়া ছেলেদের সকলের গলায় এক একছড়া মালা দিল। রমণীদের সকলের হাতে হাতে এক একছড়া মালা বিলাইয়া—অবশিষ্ট মালা-ছড়াটা হাতে করিয়া মার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল "মা, এ মালাটি আপনার ছবিকে দিন্।"

মমতাভরা মুখে চাহিয়া একটু হাসিয়া মা বলিলেন, "তুমিই দাও না ঠাকুর।"

ঠাকুর চকিতনেত্রে একবার ছবির পানে তাকাইল। তাহার পর মুহূর্ত্তের জন্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না মা, আপনি দিন্।"

রুমাল হইতে গুটিকয়েক টাকা খুলিয়া ছবির হাতে দিয়া মেসো-মশাই বলিলেন, "ছবি, ঠাকুরকে প্রণাম কর মা।"—ঠাকুরের চোখের সামনে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া উঠিল!

মাটীতে টাকা রাখিয়া ছবি প্রণাম করিল। কম্পিত হস্তে টাকা তুলিয়া মার হাতে দিয়া ঠাকুর বলিল, "আমি আপনার ছবিকে আশীর্ব্বাদ করলুম্ মা।" চিরপ্রচলিত প্রথার অপব্যবহার!

"ওকি ঠাকুর, টাকা নাও, ছবির ওতে অকল্যাণ হবে, তুমি আমাদের কত উপকার করেছ,—"

গভীরদুঃখভরা হাসি হাসিয়া রঞ্জন বলিল, "টাকা নিয়ে উপকার বিক্রী করি না মা, এ টাকা আপনার পাণ্ডার ছড়িদারদের পাওনা"—চট্ করিয়া রঞ্জন ভিড়ের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। লোকটার আত্মম্ভরিতায় হাড়ে হাড়ে চটিয়া বিদ্বেষ-বিস্ফারিত নয়নে পাণ্ডার চেলারা চাহিয়া রহিল।

৫

পরদিন মেসো-মশাইরা দেশে ফিরিয়া গেলেন। মনে একান্ত আগ্রহ থাকিলেও, কর্ত্তব্যপরায়ণ রঞ্জন বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে, তাঁহাদের কাছে উপস্থিত থাকিতে পারিল না। পরাধীন জীবনের ক্লান্তিশূন্য কর্ম্মস্রোতের প্রবল তোড়ে দুর্দ্দম্য আকাঙ্ক্ষাকে নিঃশব্দে তৃণের মত ভাসাইয়া দিয়া কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া প্রাণের মহা শূন্যতাকে কোন রকমে পূর্ণ করিতে চাহিল, পারিল কি না কে জানে!

দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল, রঞ্জন মেসো-মশায়ের পাণ্ডার কাছে সন্ধান লইতে লাগিল, তাঁহারা আসিবেন কি না, পত্রাদি কিছু আসিয়াছে কি?—

কিছুই না!—হতাশার নিদারুণ নিস্পেষণে রঞ্জনের আবেগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই উঠিতে লাগিল। হায়, মেসো-মহাশয়ের আসার গুরুত্ব কি তাহার মনের আকুলতার চেয়ে বেশী? কখনই না!

ক্রমে রথের সময় কাছাকাছি হইতে লাগিল। পাণ্ডার কাছারিতে রঞ্জনের যাওয়া আসাটা ঘন ঘন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু বিফল প্রয়াস! পাণ্ডা কোন খবরই জানে না। অবশেষে সকল সঙ্কোচ দূরে ঠেলিয়া রঞ্জন নিজে পত্র লিখিতে বসিল। পত্র লিখিল। তাহার পর একবার তাহা পাঠ করিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার কান দুইটা লাল হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ পত্রখানা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিল। ছিঃ! তাহার ছেলেমানুষী দেখিয়া তাঁহারা কি মনে করিবেন?

তবু রঞ্জন নিজেকে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। রথের দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাহার অধীরতাও তত বাড়িতে লাগিল, জীবন্ত আশা বুকে করিয়া সে প্রত্যহ ষ্টেশনে আসিয়া ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় চতুর্দ্দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, বিদেশ হইতে শত শত যাত্রী আসিতেছে, যাইতেছে, কিন্তু কই? যাহাদের খুঁজিতেছে তাহারা কই?

সুদক্ষ কর্ম্মচারী,—কাজে অমনোযোগী হওয়ায় প্রভু দুই চারিদিন মিঠে কড়া বচনে তাহাকে সাবধান হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু উদ্বিগ্ন রঞ্জনের কানে সে কথা স্থান পাইল না। ক্রমে রথের দিন আসিয়া পড়িল। জগন্নাথ রথে উঠিলেন, নাবিলেন, শুইলেন, পাশ ফিরিলেন—অবশেষে উঠিয়া বসিলেন পর্য্যন্ত, তথাপি মেসো-মহাশয়ের দেখা নাই। পূজার ছুটী আসিল, ফুরাইল, তথাপি কাহারো খোঁজ নাই!

হায়! পৃথিবীতে কেহ কাহারো অন্তর্ভেদী যাতনা বোঝে না! রঞ্জন গণিয়া গণিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত যাপন করিতেছিল। অবশেষে পূজার ছুটীর পর যখন দাসত্বজীবী, ধনগর্ব্বী হাওয়া-খাইয়েরা দলে দলে পুরী ছাড়িতে লাগিল, তখন রঞ্জন আর ভারাক্রান্ত মনটাকে লইয়া কোনমতে পুরীতে তিষ্ঠাইতে পারিল না। সে যখন কোন দিকে কিছু প্রতিকার খুঁজিয়া পাইল না তখন একদিন পাণ্ডার কাজে জন্মের মত জবাব দিয়া হঠাৎ ষ্টেশনে আসিয়া বঙ্গদেশের টিকিট কিনিয়া ট্রেনে চাপিয়া বসিল।

৬

গত রাত্রে ছবির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ বর কন্যা বিদায়। মধুর প্রভাতী সুরের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই, সানাইয়ে সেই সবে, বিদায়ের করুণ-রাগিণী বাজিতেছে—সুর বায়ুর স্তরে স্তরে ঘনায়মান হইয়া ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে পুঞ্জীকৃত বেদনায় ঠেলিয়া উঠিতেছে।

একটা লোক অত্যন্ত ব্যস্তভাবে, ব্যগ্র ঔৎসুক্যের সহিত বিবাহ-বাটীর চারিদিকে ক্রমাগত দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে; তাহার মুখে উজ্জ্বল আনন্দ, ও আকুল আতঙ্ক—যেন আসন্ন ভীষণতায় গাঢ়ভাবে ঘনাইয়া আসিয়াছে; লোকটার ভাব দেখিয়া বোধ হয় সে যেন বাড়ীর ভিতর-কার সমারোহের তত্ত্বনির্ণয়ে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু না,—তাহাও তো হইতে পারে না, উৎসবের কারণ জ্ঞাত হওয়া তো কিছুই দুরূহ ব্যাপার নয়, দলে দলে লোক বাড়ী ঢুকিতেছে, বাহির হইতেছে,—চারিদিকে ঘুরিতেছে।—কতবার কত লোকের সহিত তাহার মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হইয়া যাইতেছে, তথাপি কই, সে তো কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছে না,—বরং বন্দুকের গুলির মুখ হইতে যেমন শিকার

ত্রস্তে পলায়ন করে, সেও সেইরূপ কুণ্ঠিতভাবে সরিয়া যাইতেছে। লোকটার রকম কি ?—

কিছুক্ষণ পরে, বাড়ীর কোলাহলের ঘনঘটা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। শীগ্রী নাও শীগ্রী নাও, ট্রেনের আর সময় নেই,—চারিদিকে এমনি একটা কলরব দ্বিগুণ মুখরতায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সকলের ব্যস্ততার মাত্রা চতুর্গুণ চড়িয়া গেল।

প্রাণপণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, এইবার অন্তিম সাহসে ভর করিয়া, লোকটা বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। উৎসবের বাড়ীতে কে কাহার পানে চাহিতেছে ? লোকটা অবাধে গিয়া বাড়ীর ভিতরে উপস্থিত হইল।

প্রাঙ্গণে আলিপনা-আঁকা পীঁড়ির উপর বর ও বধূকে দাঁড় করাইয়া, পৌরাঙ্গনারা তখন মাঙ্গলিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছিল। চারিদিকে শাঁখ ও উলুধ্বনির উচ্চ শব্দ !—লোকটা গিয়া একেবারে আসন্ন আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িল। অকস্মাৎ বজ্রাগ্নি সম্পাতে তাহার চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল ! প্রচণ্ড উন্মত্ত হৃদ্‌পিণ্ডটাকে সবলে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সযত্নে পদশব্দ লুকাইয়া—সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকের মাঝে—সন্তর্পণে আপনাকে গোপন করিয়া নিঃশব্দে সে বাহিরে আসিল। কোলাহলময় জগৎ সহসা বিরাট নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল ! চারিদিক মৃত্যু-মলিন পাংশুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল, কোন দিকে একটা ক্ষীণ শব্দ অবধি আর তাহার কানে শুনা গেল না—শুনিতে সাহসও হইল না। একটা নিঃশ্বাসের শব্দ—না না, পবন অচল হোক, রুদ্ধ বায়ুতে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া যাক্—সে বরং সহ্য হইবে, তবু এ সুসজ্জিত উৎসব-ক্ষেত্রে মর্ম্মভেদী ব্যর্থতার ঈষৎস্ফুরণ !—না না, সে কিছুতেই হইবে না ! কিছুতেই না। যুগ-প্রলয়ের মহা ঝটিকা ভয়াবহ কঠিনতার গহ্বরে

ধীরে ধীরে সুপ্তিলাভ করিল, কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না, কেহ ফিরিয়া তাকাইল না!—ভগবান জগবন্ধু দেব! এখনো কামনা, এখনো একটী ভিক্ষা ঠাকুর, এক মুহূর্ত্তের জন্য এতটুকু শক্তি ভিক্ষা দাও ঠাকুর—ওগো দয়াময় এতটুকু বল, এতটুকু শুধু বল দাও!

সু-উচ্চ হর্ষনিনাদের মধ্যে একটুখানি ক্রন্দনের অভিনয় সমাপ্ত হইলে প্রকাণ্ড অশ্বযুক্ত ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে ফিটনে, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত বর বধূ সমারূঢ় হইল। গুরু গম্ভীর শব্দে মাটির অভ্যন্তরে কম্পন-হিল্লোল তুলিয়া ফিটন ছুটিল। অগ্রপশ্চাতে আরো কয়েক খানা গাড়ীতে বরযাত্রীর দল চলিয়াছে।

গাড়ী অনেক দূর আসিয়াছে। হঠাৎ বেগগামী গাড়ীর হাতল ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে একটা লোক সেই চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল! লোক-টার চক্ষু নিষ্পলক, মুখে দৃঢ় কঠোরতা, হস্ত পদে মৃত্যুর শীতলতা, শরীরে শোণিত-শূন্যতা, স্পষ্ট প্রতীয়মান। সে কোন দিকে না চাহিয়া, বরের গলায় একছড়া কর্পূরের মালা পরাইয়া দিয়া অচঞ্চল কণ্ঠে বলিল, "জগন্নাথ দেবের সেবাইত ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ, আপনার জীবন সফলতায় চির গৌরবময় হোক্।"

বর নত মস্তকে নমস্কার করিল।

তার পরে আরো কঠিন হইয়া, আরো অসঙ্কোচে—অবগুণ্ঠিতা বধূর হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া আর-একগাছি কর্পূরের মালা জড়াইয়া দিতে দিতে ধীরে ধীরে, পরিষ্কার স্বরে বলিল, "এই ক্ষণধ্বংসী কর্পূরের মত—তোমাদের জীবনের সমস্ত মালিন্য লুপ্ত হয়ে যাক্, ভগবান জগন্নাথ দেবের নামে আশীর্ব্বাদ করি তোমরা শান্তিময় সুখে সুখী হও।"

বক্তার ললাটে গভীর স্নিগ্ধতার স্মহিত মহিমাময় বিজয়শ্রীর দীপ্ত জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল! মোহের দাসত্বের মুক্তি লাভে, আত্মজয়ের

পূর্ণ সন্তোষে, মহা পূর্ণতায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল! প্রসন্ন সার্থকতায় সারা জগৎ ভরিয়া উঠিল। অপার্থিব শান্তির কিরণে সহসা চরাচর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে কি তৃপ্তি! কি আনন্দ! কি সুমহান্ জয়োল্লাস!

কণ্ঠস্বরে চমকিয়া বিস্ময়ব্যাকুলা ছবি অশ্রুসিক্ত অবনত দৃষ্টি তুলিয়া যখন কুণ্ঠিতভাবে বক্তার পানে তাকাইল, তখন সে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে! ছবি চিনিতে পারিল না, শুধু উদ্দেশে নমস্কার করিল। গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

মাতৃ-স্নেহ

১

সন্ধ্যার পর জনপূর্ণ সরাইখানা কলরব-কোলাহলে গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। এক দিকে দাবা-বড়ে, অন্য দিকে পাশা এবং অপর দিকটা বিষয়ী বুদ্ধিমান্‌দিগের মামলা-বাজীর উৎকট ছন্দে, উদ্দণ্ড সুরে ধ্বনিত হইতেছিল। প্রকাণ্ড ঘরের একটী কোণে বসিয়া আলোর কাছে হেঁট হইয়া, একজন তরুণ চিত্রকর আপন মনে তাহার সদ্যঃসম্পূর্ণ ছবিটীর বর্ণবিন্যাসগুলি গভীর মনোযোগের সহিত সংশোধন করিতেছিল। সমস্ত সরাইখানা ভরা—সমস্ত কলরব তাহার স্থির নিবিষ্ট চিত্তের পরদায় ঠেকিয়া আহত হইয়া ফিরিতেছিল, চিত্রকর নিশ্চিন্ত উদাসীন।

পাশা-খেলাওয়াড়গণের কোলাহল জাঁকিয়া উঠিতে লাগিল। অন্য দিকে একটী পয়সাওয়ালা পিতৃহীন যুবককে ঘেরিয়া মামলাবাজ আইনজ্ঞের দল কি করিয়া বিধবা মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ফাঁকী দিয়া নিরুদ্বেগে পৈতৃক সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিতে পারা যায়, তাহার পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

একটা মিথ্যা মারপিটের মামলা সাজান হইতেছিল। বুদ্ধিমান্‌ মোক্তার সুদক্ষ কারিকরের মত ঘটনাটা নিপুণতার সহিত গড়িয়া তুলিতেছিলেন। পরামর্শ চুপি চুপি চলিতেছিল, সহসা তিনি জোর গলায় শেষ কথা বলিয়া উঠিলেন, "মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে ঠোঁটটা গেল ছেঁচে!"…

তুলি হাতে চিত্রশিল্পী চমকিয়া বলিল, "কই?"—সে সবিস্ময়ে বক্তার মুখপানে তাকাইল, বক্তা নির্ব্বাক্‌! চিত্রশিল্পী উদ্ভ্রান্তদৃষ্টিতে গৃহস্থ

সকলের মুখপানে তাকাইল, তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামাইয়া দারুণ বিস্ময়ে নিজের ছবিটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কই না, তাহার ছবি তো কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই, তা তো তেমনি সুন্দর, তেমনি মনোহর—তেমনি উজ্জ্বল আছে। চিত্রশিল্পী আনন্দের আবেগে বলিয়া উঠিল, "না, ঠিক আছে!"

পরামর্শ উৎসবের কেন্দ্র সেই ধনী যুবকটী, মামলা-বাজীর সমিতির ভিতর হইতে উঠিয়া সৌৎসুক্যে তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন, "কিহে ব্যাপার কি?"

—কিন্তু ব্যাপার কি, শব্দের উত্তর দৃশ্যের মধ্যেই মিলিল। যুবক দেখিলেন, সে কি চমৎকার চিত্র!—

সদ্য দূরাগত পথ-শ্রান্ত পুত্রকে উৎসুক-নয়না জননী বক্ষে লইবার জন্য প্রসারিত-হস্তে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মানা; ঘন-কুঞ্চিত-কেশগুচ্ছ-শোভিত সুকুমার-কান্তি পুত্র হাস্যোজ্জ্বল মুখে দুই হাত বাড়াইয়া ধাইয়া আসিতেছে, কি সুন্দর, কি চমৎকার দৃশ্য! জননীর ললাটে প্রশান্তি সজল নয়নে উচ্ছ্বসিত আনন্দ, অধরে স্বর্গের সুষমা স্মিত হাসি, বক্ষে পরিপূর্ণ মমতা!

যুবক স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। চিত্রকর উল্লাসদীপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "ঠিক আছে, আমার 'মাতৃ-স্নেহ' ছবিখানি ঠিকই আছে; ঠোঁটের হাসি টুকুন্ অবধি……।"

যুবক স্তম্ভিত দৃষ্টি তুলিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, "শিল্পী—ভাই এ মূর্ত্তি কার?"

শিল্পী মুহূর্ত্ত কাল নীরব রহিল, তার পর গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল, "আমার অন্তরের—আমার ধ্যানের—প্রত্যক্ষ মাতৃ-স্নেহের!"

সে শব্দ গৃহের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ শব্দ ছাপাইয়া—সমস্ত কলরবের

ঊর্দ্ধে করুণ আবেগে কাঁপিয়া উঠিল! চালবাজ মোক্তারের মাথায় এতক্ষণ যতগুলি ফন্দীর অন্ধি সন্ধি দ্রুত লীলায় ঘুরিতেছিল, সেগুলি মুহূর্ত্তের জন্য —ইন্দ্রজাল-মুগ্ধ মূঢ়ের মত স্তব্ধ হইয়া গেল!—কিন্তু হায় রে—অভ্যাসের জয়,—সারা জগতের উপর যে! মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া মোক্তারটী প্রবল বিজ্ঞতায় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমার কলা কৌশলে বোধ শোধ মন্দ নয়, তবে কি জান, প্রতিপাদ্য বিষয়টা—তেমন কিছু নয়, নেহাৎ হাল্কা!"

শিল্পী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার সেই ক্রূর দম্ভপূর্ণ প্রখর বুদ্ধিজীবী, আইনদক্ষ লোকটীর মুখপানে চাহিল!—হাঁ হাঁ ঠিক এমন নিষ্ঠুর স্বার্থ-সর্ব্বস্ব নীচ দৃষ্টি না হইলে কি চিত্র বর্ণিত দৃশ্যটা তুচ্ছ বে-আইনী ব্যাপার বলিয়া ঠাওর করে! ধিক্! শিল্পীর দুই চক্ষু ঘৃণায় ঝলসিয়া উঠিল, শিল্পী বেগে মুখ ফিরাইল!

কম্পিত কণ্ঠে সেই পয়সাওয়ালা যুবক বলিল, "ভাই যত দাম চাও দিতে রাজী, এ চিত্রখানি আমায় দাও।"

শিল্পী গম্ভীর দৃষ্টিতে যুবকের পানে চাহিল, সে চাহনির তেজ-স্ফূরিত আলোকে যুবকের গোপন মর্ম্মের সমস্ত দৃশ্য যেন প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! যুবক সহ্য করিতে না পারিয়া অপরাধীর মত মাথা নামাইল, শিল্পী দৃঢ় স্বরে কহিল, "না।"

তার পর একটী কথা বলিবার বা শুনিবার অবকাশ রহিল না, শিল্পী গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল।

ঘরের নির্লজ্জ লোকগুলা সহসা দুঃসহ অপমান বোধ করিয়া নিষ্ফল ক্রোধে শিল্পীর ও শিল্পের কুৎসা জুড়িল!

২

সারা আদালত লোকে লোকারণ্য। আজ মাতা পুত্রের মামলার দিন! সম্পত্তি লইয়া বিবাদ? বাদী পুত্র, প্রতিবাদিনী মাতা! কি জমকাল হুজুক? সারা সহরটা ভাঙ্গিয়া আদালতে আসিয়াছে।

আদালতের কাছে একটা দোকানে কতকগুলি লোক জটলা করিতেছিল। কেহ পান, কেহ তামাক খাইতেছিল, আর গল্প করিতে করিতে হো হো হাসির ঢেউ তুলিতেছিল।

সেই ধনী যুবকটী অত্যন্ত সাধারণ বেশে ম্লানমুখে অন্য দিকে একটা গাছতলায় নিঝুম হইয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন। তাঁহার উদ্বেগ-কাতর ললাটে মর্ম্মভেদী বিষাদের অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছিল। যুবক কেবলই ভাবিতেছিলেন মানুষ মানুষকে ফাঁকী দিয়া সহস্র সম্পত্তি লইয়া নিজের বাহিরের ভাণ্ডার যতই ভরিয়া তুলুক না কেন—তাহার হৃদয় ভাণ্ডারটা কেবল সেই অগাধ অপরিমেয় অতৃপ্তির দাহ-জ্বালায় ভরিয়া উঠিবে!

মুহ্যমান যুবক নীরবে ভাবিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে শিবিকা-রোহণে কোন পর্দ্দানসীন মহিলা আদালত গৃহের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন, চারিদিক উৎসুক জনতার অস্ফুট গুঞ্জনে ধ্বনিয়া উঠিল—"ঐ—ঐরে!"

দূরাগত অস্ফুট চাঞ্চল্যের মৃদু অভিঘাতে যুবক মুখ তুলিয়া চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। হাঁ, হাঁ, কৃতী পুত্রের দুর্ভাগিনী গর্ভধারিণীই আজ অপমান কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে লইয়া রাজকীয় বিচারালয়ের দ্বারে পৌঁছিয়াছেন বটে? আঃ!

যুবকের মস্তিষ্কের ভিতর উচ্ছৃঙ্খল আকুলতার সুরে মর্ম্মভেদী বেদনার ঝঞ্জনা জাগাইয়া তুলিল।……যুবক হৃদয়হীন স্বার্থপরতার দীন দ্বন্দ্ব

কাটাইয়া মুহূর্ত্তে অন্তরের মাঝে সতেজে সোজা হইয়া উঠিল। কোন দিকে না চাহিয়া সহসা তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া শিবিকার দ্বার উন্মোচন করিয়া মাতার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিকল কণ্ঠে বলিল, "মা—মা, আমায় ক্ষমা কর।"

আকাশস্পর্শী অনির্ব্বাণ বহ্নিশিখার উপর যেন সপ্ত সমুদ্রের শান্তি-নির্ব্বাণ বারি যুগপৎ ঝাঁপাইয়া পড়িল। জননীর চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল, তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কেবল সযত্নে পুত্রের মাথাটী বুকে তুলিয়া তাহার উত্তপ্ত ললাটে একটি ক্ষমাপূর্ণ শীতল স্নেহের চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিলেন!

মাতা পুত্রের কাহারই মুখে কথা নাই, কেবল দুইজনেই রুদ্ধ আবেগে বুক-ফাটা অভিমানে অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সে কি গভীর বেদনা! কি নিগূঢ় শান্তি!

খানিক পরে কোথা হইতে সংবাদ পাইয়া সেই আইনবাজ, কর্ত্তব্য-পরায়ণ মোক্তারটী এই বে-আইনী ব্যাপারটা সংশোধন করিবার জন্য শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ও মশাই শীঘ্রী আসুন, হাকিম এখনি মামলা ধর্‌বেন।"

মুখ ফিরাইয়া তীব্র স্বরে যুবক বলিল, "কিসের মামলা? কে ধরে?—আমাদের মামলা রদ্ হয়ে গেছে!"

পশ্চাৎ হইতে মোক্তারের গড়া পেটা চেলা চামুণ্ডার দল কোলাহল করিয়া বলিল, "সে কি মশাই, আমরা যে সাক্ষী।"

দীপ্ত নেত্রে চাহিয়া যুবক বলিল, "চুপ অপদার্থ ছোটলোকের দল, ঘৃণা হয় না! মাতা পুত্রের মনোমালিন্যের মাঝখানে সালিশীর মুখোস পরিয়া শয়তানী করতে লজ্জা হয় না!—মাতা পুত্রের এ বিবাদ, এ অন্তর-দ্বন্দ্বের ধারা, আজও রাজার আইনে বিধিবদ্ধ হয় নাই, রাজার বিচারা-

লয়ের সাধ্য কি যে আমাদের এ হৃদয়ভেদী সমস্যায় দন্তস্ফুট করে!—চলে যাও তোমরা, আমার সমস্ত অভিযোগের মীমাংসা সমাধান হইয়া গিয়াছে, সকলের চেয়ে উচ্চ আদালতে—এইখানে!”—যুবক মাতার চরণের নীচে নিজের মাথাটি পাতিয়া দিল।

লোকগুলা মুখ চাওয়া-চায়ি করিয়া পিছু হটিয়া গেল। এ যে অসহ্য বিশ্রী ব্যাপার, কাজের সময় এমন ছেলেমানুষী! ভারি অন্যায় ছিঃ, নেহাৎ বাঁদর।

অন্তরীক্ষে দ্বিপ্রহরের রৌদ্র—তপ্ত পবন কর্কশ কৌতুকে হা হা করিয়া, অট্টহাস্যে প্রশ্ন করিলেন কে—কে—কে!

পুত্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল “মা, সব ভুলে যাও”। কোমল কণ্ঠে জননী বলিলেন “ভুলিয়ে তো দিয়েছিস্ বাবা!”

পুত্র মুখ তুলিয়া চাহিল, হাঁ সেই ক্ষমা—সুন্দর, শান্ত, স্নেহপূত, মাতৃ-মূর্ত্তিই বটে। ললাটে সেই স্বর্গ-সুষমা-দীপ্তি, অধরে সেই অপার্থিব, পুণ্যস্মিত হাসি! কি অপরূপ লাবণ্য, কি সুমহান্ মাধুর্য্য রে, সমস্ত প্রাণ যে জুড়াইয়া গেল। অন্ধ মূঢ় তাই সে, এত দিন এই ত্রিদিব-লাঞ্ছিত মাতৃস্নেহ সে অবজ্ঞায় পদদলিত করিয়া আসিয়াছে। কি ভ্রম! আজ যে বুদ্ধিমান্ যাই বলে বলুক—সে কিছুতে মানিবে না, মাতৃস্নেহ মর-শিল্পীর কল্পনা-সৃষ্ট অলীক বস্তু নয়, তুচ্ছ ব্যাপার নয়।—এ স্বয়ম্ভু-সৃষ্ট রমণীর মহৎ ব্যাপার!

মানুষ যখন শ্রেয়ঃর মহিমা ভুলিয়া প্রেয়ঃর চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া রসাতলের দিকে অগ্রসর হয়, তখন যে শক্তি শুভ সহৃদয়তার বলে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফিরিবার শক্তি সৃজন করিয়া দেয় তাহাই তো শিল্প, তাহাই তো সার্থক। তাহা যে সহস্র যুগ ধরিয়া, সহস্র হৃদয়ের সহস্র চিন্তা-বিকশিত অভিজ্ঞতার কল্যাণভাগিনী! অমৃতের মত চিরদিনই সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রে,

কলা কৌশলে, তাহা সহস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ সত্যকার জবর-জম্‌কাল আস্ফালনকারী কাজের লোক তাহা কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দিক্—কিন্তু হৃদয়ের 'নিরিখের' কাছে সেই মুখের কিছু নয়, সত্যের কিছু নয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া যায়। তাহাকে আটকাইবার সাধ্য কাহারও নাই।

যুবক স্তব্ধ-মুগ্ধ-নীরব।—অকস্মাৎ নিবিড় নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া একখানি প্রসারিত চিত্র হস্তে এক তরুণ, সুন্দর মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া হর্ষ-বিকম্পিত স্বরে বলিল "এই নিন্ মশায়, আপনার সেই ছবি।"

যুবক চকিতে দেখিলেন সেই সরাইখানার শিল্পী। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তিনি সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "একি তুমি—এখানে—"

প্রসন্ন উজ্জ্বল হাস্যে শিল্পী বলিল, "হাঁ ছবিতে আজ আমার রং ফলান শেষ হয়েছে, তাই আপনাকে দিতে এসেছি।"

যুবক আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তুমি যে বলেছ আমায় দেবে না।"

"হাঁ সেদিন আপনার মুখ দেখে মনে হয়েছিল, এ চিত্রের মর্ম্ম আপনি বোঝেন নি, আজ আমার ভ্রম গেছে, ক্ষমা করুন, আমার চিত্র আজ বাস্তবের মধ্যে সার্থক হয়েছে!"

যুবক শ্রদ্ধা-মুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার শিল্পীর পানে চাহিলেন, একবার চিত্রের পানে চাহিলেন, তার পর আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে জননীর স্নেহোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিলেন। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তরুণ শিল্পীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কহিলেন, তুমিই জ্ঞানদাতা গুরু,—সহৃদয় সহোদর! সংসারে তুমিই ধন্য!

যুবা ধূলার উপর জানু পাতিয়া বসিয়া সেই চিত্র মাথার উপর তুলিয়া লইলেন।

চারিদিকের জনতা মুগ্ধ, স্তম্ভিত।

একাদশী

১

স্থানটা সমুদ্রের ধারে—ওয়ালটেয়ার। পূর্ব্বদিন সারারাত জাগিয়া—নাচ তামাসা দেখিয়া, একাদশী সমুদ্রের তীরে বালির উপর একটা পাথরে মাথা রাখিয়া অগাধে ঘুমাইতেছে, সময় তখন মধ্যাহ্ন অতীত। স্নানার্থীর বেশে একদল মেম ও সাহেব—ছোট বড় ছেলে মেয়ে সঙ্গে, ললিতা-চপল হাসির লহরী তুলিয়া ছুটাছুটী লাফালাফি করিতে করিতে নিদ্রিত একাদশীর পাশ দিয়া, স্নানের জন্য সমুদ্রে গিয়া নামিল।

বহুক্ষণ গাঢ় নিদ্রার পর একাদশীর ঘুমটা তখন পাতলা হইয়া আসিয়াছিল, কাযেই স্নানার্থিগণের কৌতুক-উল্লাসিত সেই মধুর হাস্য ঝঙ্কারে নিজের আবেশ জড়তাটী রাখিয়া, নিদ্রা মহাশয় নিঃশব্দে পিট্‌টান দিলেন, একাদশী উঠিয়া বসিল।

তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কের ভিতর তখনও গত রাত্রির সেই নাচ তামাসার গোলমালের জের চলিতেছিল, সুতরাং প্রথমটা নিদ্রোত্থিতের বারম্বার বিস্ফারিত চক্ষে এদিক ওদিক চাহিয়া অবসাদ ঘোর কাটাইবার চেষ্টা করিল, চারিদিকের দৃশ্যটা ভাল বোধগম্য হইল না, মনে হইল রঙ্গভূমিতে এক দল সং আসিল বুঝি!—হাই তুলিয়া গা ভাঙ্গিয়া, চোখ রগড়াইয়া ভাল করিয়া চাহিল,—নাঃ সং নয় সমুদ্র বটে!

তাইত—এত বেলা পর্য্যন্ত সে এখানে ঘুমাইতেছে!

ধড়্ ফড়্ করিয়া একাদশী উঠিয়া পড়িল! কোমর হইতে গামছা খুলিয়া, তাড়াতাড়ি সমুদ্রের জলে নামিয়া, গা, হাত, পা, মাজিতে লাগিল,

অনেক বেলা পর্য্যন্ত রৌদ্রে পড়িয়া ঘুমানয় তাহার কণ্ঠা পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে, রাত জাগিয়া তামাসা দেখা কি নিগ্রহ!

ওদিকে সেই গেঞ্জি পরা, পায়জামা আঁটা সাহেব মেমের দল, সমুদ্রের দেদার ঢেউয়ে নাকানি চুপানি খাইয়া, ঢেউয়ের তোড়ে, ছিট্‌কাইয়া হেথা হোথা ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—ছেলেরা শুদ্ধ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে! সমুদ্রের এক একটা ঢেউ দুরন্ত আবেগে উছলিয়া আসিতেছে, আর উলট্ পালট্ পরায়ণ স্নানার্থিবৃন্দের উচ্ছ্বসিত তরল হাসির ঢেউ বায়ুস্তর ছাপাইয়া উঠিতেছে! কি আমোদ! কি আমোদ!

তাড়াতাড়ি গামছা কাচিয়া, গোটা দুই ঢেউ খাইয়া, একাদশী জলে দাঁড়াইয়াই মাথা মুছিতে লাগিল, উষ্ণ মস্তিষ্কের রক্ত ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক নূতন ভাবনা জুটিল এত বেলায় বাড়ী যাইলে দাদা কি বলিবে?

যাহা বলিবে তাহা স্পষ্ট পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে, অতএব সেটুকু বরদাস্ত করা ভিন্ন উপায় নাই, সুতরাং সেই জন্যে মনটা পূর্ব্ব হইতে চাঙ্গা করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কায!—একাদশী গামছা পরিয়া জলে খেলাইয়া খেলাইয়া কাপড়খানা কাচিতেছে, এমন সময় একটা মস্ত ঢেউ আসিল, একাদশী হেঁট হইয়াছিল,—যেমন তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া দাঁড়াইবে—অমনি পশ্চাৎ হইতে দুই শুভ্র কোমল ক্ষুদ্র বাহু আসিয়া, তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিল! সঙ্গে সঙ্গে কচি কণ্ঠ নিঃসৃত—বিকৃত উচ্চারণে ব্যগ্র মধুর অনুরোধ "ওগো আমায় ঢেউ খাওয়াও না!"

বিস্মিত একাদশী ফিরিয়া চাহিল, সাত আট বৎসরের একটী সাহেব সন্তান!—কি সুন্দর ছেলে! স্নিগ্ধ প্রীতিতে একাদশীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

উন্মত্ত সিন্ধুর তটাভিহত ঢেউ আবার নামিয়া চলিল, পায়ের তলা

হইতে বালিগুলো পর্য্যন্ত সরাইয়া!—ক্ষিপ্র হস্তে ছেলেটাকে আট্‌কাইয়া ধরিয়া একাদশী ঢেউয়ের প্রখর বেগ ঠেলিয়া, লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া তীরে উঠিল, জলসিক্ত কাপড়খানা ঠিক্‌ঠাক করিয়া গুটাইয়া সুটাইয়া কোমরে কসিল।

ফুটফুটে সুন্দর শীর্ণ কলেবর ছেলেটী মুখ চোখের লবণাক্ত জল, হস্ত দ্বারা মুছিতে মুছিতে বিস্ময়োজ্জ্বল নীল চোখ দুটী তুলিয়া ব্যগ্র কৌতুকে, একাদশীকে দেখিতে লাগিল,—অদূরে তাহার সঙ্গীরা জলের ভিতর লাফালাফি করিয়া উচ্চ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হাসিতেছে,—হা-হা হা-হা হাঃ!

বেলা ঢের হইয়াছে, একাদশী এখনো কিছু খাইতে পায় নাই, তবু এই অপরিচিত ছোট বালকটীর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, বুঝি এড়াইবার ইচ্ছাও ছিল না। এই ছোট ছেলেটীর জন্য সে আবার জলে নামিতে প্রস্তুত হইল, এবার নামিলে যে শীঘ্র উঠা হইবে না, তাহা সে বেশ বুঝিল, তথাপি কিছুমাত্র দমিতে রাজী হইল না! এই কোমল কচি ছেলেটীকে খুসী করিবার জন্য সে কোন্ মুখে নিজে একটু দুর্ভোগ স্বীকার করিতে পিছাইবে? সে কি এমনি হৃদয়হীন—না!

ভাই ত যাহা বলিবার তাহা বলিবেই, না হয় আর একটু বেশী করিয়া বকিবে, তা বলিয়া—নাঃ!

একাদশীর মুখে নির্ভীক উৎসাহের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, কোমরে গামছা বাঁধিয়া প্রিয়দর্শন বালকটীকে পিঠে লইয়া, সে ঝপাৎ করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল,—"চল সাহেব সাঁতার দিয়ে তোমায় ঢেউ খাইয়ে আনি!"

ছোট বালকের স্ফূর্ত্তি দেখে কে! এমন করিয়া এ পর্য্যন্ত কেউ তাহাকে ঢেউ খাওয়াইতে পারে নাই! আহা এই লোকটী কি ভাল!

কি অদ্ভুত ইহার সাহস!—উল্লাস আবেগে বালক প্রাণপণে একাদশীকে আঁকড়াইয়া ধরিল!

ডিগ্‌বাজী ও সাঁতারের নানাবিধ কস্‌রতের সহিত প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া, জলরাশির সহিত ঘোরতর কুস্তি করিয়া ছেলেটাকে পিঠে লইয়া একাদশী সাঁতার কাটিয়া বেড়াইল! তাহার পর সাহেব গোষ্ঠীর সকলকে একে একে তীরে উঠিতে দেখিয়া একাদশীও তীরে উঠিল, ছেলেটাকে পিঠ হইতে নামাইয়া দিয়া নিজের কাপড় গামছা নিঙ্‌ড়াইয়া পরিতে লাগিল।

শীস্‌ দিয়া লাফাইতে লাফাইতে বালক আত্মীয়দের দিকে ছুটিল "বাবা বাবা, খুব মজা হয়েছে, আমি এক অপরিচিত বন্ধু পেয়েছি!"

পিতা সবে জল হইতে উঠিয়া হাঁটুর পাজামা গুটাইতেছিলেন, অন্যমনে বলিলেন, "কি হয়েছে ফ্লরিণ, কি পেয়েছ?"

"বন্ধু বাবা, অপরিচিত বন্ধু, ভারি ভাল!"

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাহার দিদি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন "কোথায়?"

"ঐ যে ঐ কাপড় পর্‌ছে!"

"আরে বাঃ! ও আমাদের মেহর আলী নয়? আমরা মনে করিছিলুম তুমি বুঝি মেহর আলীর পিঠে আছ, ও কে?"

"ডেকে আন দেখি—"

"আচ্ছা আনছি," বালক সোৎসাহে ছুটিল! গামছা মাথায় জড়াইয়া একাদশী তখন ঘরমুখো হইবার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় ফ্লরিণ গিয়া একেবারে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, আগ্রহান্বিত কণ্ঠে, ডাকিল "আরে এস এস, তোমায় আমার বাবা ডাক্‌ছেন!"

কি বিপদ্‌! আবার ডাক!—মিনতির স্বরে একাদশী বলিল, "কাল হবে সাহেব আজ ঢের বেলা হয়েছে, আর বেশী দেরী হলে বাড়ীতে বক্‌বে!"

"তোমায় বক্‌বে ?" চোখ দুটা যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া, অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বালক বলিল, "তোমায় বক্‌বে ?"

যেন একাদশীকে তিরস্কার করিতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে থাকাটা ভারি অসম্ভব!

একাদশী মৃদু হাসিল—"চল সাহেব বেলা তো হয়েছে, আর একটু হোক্, চল দেখা করে আসি।"

"এস এস"—খুব ব্যগ্রভাবে তাহার হাত ধরিয়া ছেলেটী টানিয়া লইয়া চলিল। দলবলের কাছাকাছি হইয়া একেবারে উচ্চ কণ্ঠে অভিযোগ ঘোষণা করিল, "বাবা দেরি করে গেলে বন্ধুকে বাড়ীতে বক্‌বে। শীগ্গী ছেড়ে দিও।"

ছেলেটীর অযাচিত ওকালতীতে একাদশী ভারি লজ্জায় পড়িয়া গেল, তাড়াতাড়ি আরক্ত মুখে সাহেবকে অভিবাদন করিয়া, ভিজা গামছাখানা গায়ে জড়াইয়া সসঙ্কোচে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব দেখিলেন পুত্রের বন্ধু এক ষোল সতের বছরের তরুণ বালক, তাহার রংটী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখখানি বেশ সুশ্রী, চোখ দুটী স্বচ্ছ সরলতায় গঠিত, মোটের উপর ছেলেটী বেশ কমনীয় বটে! হঠাৎ দেখিলেই যেন ছেলেটীর উপর ভারি মমতার উদ্রেক হয়, সাহেব স্নেহময় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি বাছা ?"

"একাদশী।"

"কি জাত ?"

"মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ।"

"তোমার বাপ মা কে আছে ?"

"কেউ নাই সাহেব, শুধু ভাই আছেন।"

উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করিয়া সাহেব জানিলেন তাহাদের বাড়ী এখান

হইতে আধ ক্রোশ তফাতে, তাহার দাদার এক দোকান আছে, সেই দোকানেই সে কাজ করে, লেখা পড়া সামান্যই জানে, তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই।

"বেশ ঐ দেখ আমার হল্‌দে রংএর কুঠী, আজ বৈকালে ঐখানে আমার সঙ্গে দেখা কোরো, বুঝলে?"

"বহুত আচ্ছা সাহেব।"

৩

দিন পনের পরে—সাহেবদের অনেক জেদাজেদী ও একাদশীর আগ্রহাতিশয্যে, অবশেষে বাধ্য হইয়া একাদশীর দাদা, ভাইকে সাহেববাড়ী চাকরী করিতে দিতে সম্মত হইল।

সিদ্ধ-মনোরথ একাদশী প্রফুল্ল মুখে আসিয়া কাজে লাগিল, কাজ কেবল সাহেবের ছোট ছেলে রোগগ্রস্ত ফ্লুরিণের সাহচর্য্য। ফ্লুরিণকে লইয়া চারিদিকে বেড়ান, নানা উপায়ে তাহাকে খুসী রাখাই একাদশীর কাজ,—অথবা রীতিমত খেলাও বলা যাইতে পারে।

ফ্লুরিণ যক্ষ্মাকাশ রোগগ্রস্ত, তাহাকে বায়ু পরিবর্ত্তন করাইবার জন্যই সাহেব পরিবার এ অঞ্চলে আসিয়াছেন। সাহেব বঙ্গদেশের কোন উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারী, আপাততঃ ছুটিতে আছেন।

দূষিত রোগ বলিয়া পিতামাতা চিকিৎসকের মতানুসারে ফ্লুরিণকে একাকী স্বতন্ত্র কক্ষে নিদ্রা যাইতে দিতেন, এতদিন পর্য্যন্ত বালক এ নিয়ম নির্ব্বিবাদে পালন করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এত দিনের পর একাদশীকে পাইয়া তাহার মত বিগড়াইয়া গেল, বাড়ীর লোক ব্যবস্থা করিল ফ্লুরিণের শয়নকক্ষের পাশের ঘরে একাদশী শুইবে, কিন্তু একাদশী ও ফ্লুরিণ গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া সে নিয়ম একেবারে উল্টাইয়া ফেলিল।

সকলের সংসর্গ হইতে ফ্লরিণকে যে একটু স্বতন্ত্র রাখা হয়, এটা একাদশীর নিকট অমার্জ্জনীয় অন্যায়! কেন রে বাপু, এতটুকু কোমল সোণার শিশু, সে কি এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে তাহাকে এমন নিদারুণ শাস্তিভোগ করিতে হইবে? সে কাহারও সহিত ইচ্ছামত মিশিতে, খেলিতে পাইবে না,—অস্পৃশ্য প্রাণীর মত দূরে দূরে থাকিবে, কেন—একি অন্যায়? না, যে পারে সে এ ব্যবস্থা মানিয়া চলুক, একাদশী ইহা সহ্য করিতে পারিবে না, কিছুতেই না!

তীব্র বিষাদ তাহার মনের মধ্যে ক্রমশঃই ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল, এমন নিষ্ঠুর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহার মনটা অত্যন্ত বিরূপ হইয়া দাঁড়াইল! না, যে একলাই ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে, না থাক সাহায্য, না থাক সম্বল, সমস্ত ধাক্কা সে একলাই সাম্‌লাইবে।

একাদশীর যতই মনে হইতে লাগিল ফ্লরিণ সকলের নিকট হইতে পৃথক্, অদৃষ্ট দেবতা তাহাকে সকলের সাহচর্য্য হইতে তফাৎ থাকিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই কড়াকড় হুকুম জারী করিয়া—অসহায় শিশুকে এমন ভাবে জব্দ করিতেছেন,—ততই ফ্লরিণের প্রতি তাহার সহানুভূতি আরও জাগিতে লাগিল। না না, সে একলাই এই সব অন্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে, একলাই সকল ক্ষতিপূরণ করিবে!

কিন্তু তাহার জেদের বাড়াবাড়িতে আবার উল্টা উৎপত্তি হইয়া দাঁড়াইল, পরের ছেলেটার শুভাশুভের চিন্তায় বাড়ীর সবাই অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। একদিন স্বয়ং সাহেব,—ফ্লরিণের অজ্ঞাতসারে—তাহাকে ডাকিয়া ফ্লরিণের রোগের সংক্রামকতা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বুঝাইয়া বলিয়া তাহাকে সতর্ক হইতে উপদেশ দিলেন। আপনার সন্তান হইলে কি হয়,—ন্যায়নিষ্ঠ সাহেব তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে অনুরোধ করিলেন, "সাবধান হতে পার ভাল, না হয় তুমি ছুটী নিয়ে বাড়ী যাও বাছা!"

একাদশী সে কথার কোন জবাব দিল না, মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি সাহেবের কামরা হইতে বাহিরে আসিল। কুঠীর সামনে মাঠে ফ্লুরিণ একলা ছুটাছুটী খেলিতেছিল, হঠাৎ ব্যগ্রভাবে একাদশী সেখানে আসিয়া আচম্‌কা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল!—"দাদা ফ্লুরিণ ভাই আমার!"

একাদশী সবলে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল, তাহার চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল, ফ্লুরিণ অবাক্!

ফ্লুরিণের কাছ হইতে তাহাকে ছিনাইয়া লইবে? কে লইতে পারে লউক! সে কিছুতেই ফ্লুরিণকে তফাৎ করিবে না, ফ্লুরিণ যদি রোগগ্রস্ত হয়, তবে তাহারই বা সুস্থ থাকিয়া লাভ কি? না সে অমন নির্দ্দয়ভাবে সুস্থ থাকার শাস্তি ভোগ করিতে পারিবে না কিছুতেই না!—

একাদশী দৃঢ়হস্তে ফ্লুরিণকে জড়াইয়া ধরিল, যেন তখনই সত্য সত্যই কে ফ্লুরিণকে তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে!

রক্তের সম্পর্কই দুনিয়ায় সব চেয়ে বড় দাবী, তাহার কাছে মাথা গলাইবার অধিকার আর কাহারও নাই, কেউ যদি প্রসাদ ভিক্ষায় নত-শিরে সেখানে আসিয়া দাঁড়ায়,—তবে অমনি চারিদিক হইতে হাজার জোড়া শাসনের রক্তবর্ণ চক্ষু বজ্র দীপ্তিতে হুঙ্কার করিয়া জ্বলিয়া উঠে! কি উৎপীড়ন! ওগো নিজের ছেলেকে সবাই ভালবাসে, তা বলিয়া পরের কি সেখানে আসিয়া দন্তস্ফূট করিবার ক্ষমতাটুকু দিতেও তোমরা কাতর! —অভিমানে ক্ষোভে একাদশী সোচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া ফেলিল।

৩

তাহার পর দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে, স্থান পরিবর্ত্তনের গুণে, প্রথম দিনকতক ফ্লুরিণ একটু সবল সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল, ওজনেও বাড়িয়াছিল,

কিন্তু তাহার পর আবার অবস্থা মন্দ হইতে দেখা গেল। চিকিৎসকগণ উপর্য্যুপরি ঔষধ বদলাইতে লাগিলেন। আত্মীয়স্বজন উদ্বিগ্ন হইলেন। পিতা মাতা হতাশার আকুলতা বুকে চাপিয়া গণিয়া গণিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত কাটাইতে লাগিলেন।

আর একাদশী!—চতুর্দ্দিক হইতে সেই সব অজানা আশঙ্কার অস্ফুট গুঞ্জন, সব বিষণ্ণ ব্যাকুলতা,—তাহাকে যেন মুহুর্মুহু বিভীষিকার বেষ্টনীতে জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিতে লাগিল। সেই নিঃশব্দ ঘনীভূত উদ্বিগ্নতার মাঝে একাদশীর অধীর চিত্ত, শত উৎকণ্ঠার সহস্র হস্ত বিস্তার করিয়া, সেই জ্বর-তপ্ত রুগ্ন শিশুকে আগ্‌লাইয়া রহিল। প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, বুঝিবা সত্য সত্যই ছাড়াছাড়ি হয়?

আজ এক মাস শিশু শয্যাগত। তাহার উঠিবার শক্তি নাই, একাদশী ম্লান ছায়ার মত এক মাস অহোরাত্র তাহার সঙ্গী। সকলের বকাবকির জন্য স্নানাহার করিতে একবার করিয়া উঠে, আর রাত্রিতে যখন নিদ্রা-ভারে চক্ষু দুটো খুলিয়া রাখিবার ক্ষমতা একেবারে লোপ হইয়া যায়, তখন রোগীর শয্যাপ্রান্তে মাথা রাখিয়া সেই খানেই পড়িয়া একটু ঘুমায় মাত্র।

অবস্থা বুঝিয়া সাহেব তাহাকে নানা ছুতায় কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাকে নড়ায় কে? সাহেব মাহিনা পত্র হিসাব করিয়া একাদশীকে জবাব দিলেন। একাদশী সাহেবের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নির্নিমেষ নয়নে শীর্ণাকৃতি পাণ্ডুর-কপোল, নিদ্রালস বালকের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিল!

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। নিজের ছেলেতো বাঁচিবেই না, কিন্তু তাঁহার ছেলের জন্য কি পরের ছেলেও মারা যাইবে? এ যে বড় মুস্কিল!

যত দিন যাইতে লাগিল, একাদশীর উদ্বেগ ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে একে একে সকল আলো নিবিয়া যাইতে লাগিল। সমুদ্রের ঢেউ, তীরের বালি, বাগানের ফুল, মাঠের খেলা —সমস্ত লোভনীয় ব্যাপারগুলোই কোথায় কি নয়—ছয় হইয়া গোলমাল পাকাইয়া গেল! পেটের ক্ষুধা, চোখের ঘুমও ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। রহিল শুধু সেই একাগ্রচিত্তে রোগীর সেবা, আর উৎকণ্ঠা ব্যাকুল মুখে রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকা!

অষ্ট প্রহর রোগীর পাশে দূষিত হাওয়ায় আবদ্ধ একাদশীকে,—সাহেব, মেম দুজনে আসিয়া বলিলেন, "যাও একাদশী, সমুদ্রের ধার দিয়ে একটু বেড়িয়ে এস, আমরা এখানে বস্‌চি।"

একাদশী উঠে না, সাহেব হাত ধরিয়া তুলিয়া ঠেলিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন, একাদশীর আতঙ্ক বাড়িয়া উঠিল, কোন রকমে পা পা করিয়া কুঠীর ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া—তাহার পর সহসা ফিরিয়া, —ছুটিয়া গিয়া আবার ঘরে ঢুকিল—"দোহাই সাহেব, বাইরের হাওয়া আমার সহ্য হচ্ছে না, আমি ঘরে বেশ থাক্‌ব।"

৪

ফ্লরিণ সর্ব্বদাই তন্দ্রাচ্ছন্ন, নির্ঝুম। তাহার মুখের রং দিন দিন অত্যন্ত ফ্যাকাসে হইয়া আসিতেছে, চামড়া ঠেলিয়া পাঁজরের হাড়গুলা উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, গোলাপের রাশীকৃত পাপড়ীর মত কোমল—তাহার হাত দুখানি এখন শ্লথ ও শীর্ণ—অস্থি কঠিন হইয়াছে, অলস মুদ্রিত চোখে সর্ব্বদাই সে ডান পাশে শুইয়া আছে, কিন্তু ডাকিলেই সাড়া পাওয়া যায়।

সে দিন আকাশে খুব মেঘ করিয়াছিল, কয়দিন হইতেই এমনি গুমট হইয়া আছে। সন্ধ্যার পর মেঘ আরো ঘনীভূত হইয়া, বিদ্যুৎ বর্ষণ

করিতে করিতে, আকাশময় ছুটাছুটী করিয়া খেলিতে লাগিল, তার পর ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিল, সকলে বুঝিল ঘূর্ণ বাত্যা।

জানালা সার্শি বন্ধ করিয়া, ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়া কাজ চলিতে লাগিল। বাহিরের ভীষণতায় ভীত, অভিভূত একাদশী, রোগার্ত্ত বালককে বুকে করিয়া উৎকণ্ঠায় আকুল প্রাণে বসিয়া রহিল। ঝড় যত ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া, গোঁ গোঁ শব্দে হুঙ্কার করিয়া আসে, সেও তত আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠে! কড়্ কড়্ করিয়া বজ্র ডাকে, ঝড়ের আঘাতে জানালা দুয়ার ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠে, সমস্ত ঘর বাড়ী কাঁপিতে থাকে—আর একাদশী রোগাচ্ছন্ন বালকটিকে দুই বাহুর নীচে আড়াল করিয়া ধরে! তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিটা,—একটা নিগূঢ় শয়তানীর 'সলা' আঁটিয়া মহা উল্লাস রোলে, তাহাদের দুটী প্রাণীকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে! চারিদিকেই যেন একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের মূর্ত্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, ওঃ কি বিভীষিকা!

হায়! ওগো কে কোথায় আছ, বলিয়া দাও, কি করিয়া সে এত বিঘ্ন হটাইয়া এই ছোট শিশুটীকে আপনার করিয়া রাখে! চারিদিকের এই সব বিশৃঙ্খলতার উদ্যোগ আয়োজন—প্রকৃতির এই করাল উন্মাদন-সঙ্গীত, এ যেন কেবলই এই নিঃস্ব দরিদ্রের বক্ষ হইতে এই ক্ষুদ্র কপর্দ্দক-টুকু লুটিয়া লইবার উৎকট উৎসব রোল বলিয়া মনে হইতেছে! ওগো কে আছ শক্তিমান্ সাহায্য কর, বাঁচাও, ওগো রক্ষা কর!

নিষ্পলক নেত্রে বালকের মুখপানে চাহিয়া, নিস্পন্দ নির্জ্জীবের মত একাদশী প্রলয়ঙ্কর উদ্বেগ বুকে লইয়া, সমান ভাবে বসিয়া রহিল।

৩

তিন দিন তিন রাত্রি আকাশের অবস্থা সেইরূপ থাকিয়া চতুর্থ দিনে ঝড় থামিল, মেঘ কাটিয়া গেল, পরিষ্কার সূর্য্য উঠিল। একাদশী মনের উৎকণ্ঠা ঝাড়িয়া স্ফূর্ত্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজেকে বিপদ্ মুক্ত মনে করিয়া অত্যন্ত স্বস্তি লাভ করিল। হাল্কা বুকে, হাসি মুখে, ঘর হইতে বাহির হইল। আঃ কি চমৎকার আজ চারিদিকের চেহারা! কি সুন্দর স্বচ্ছ শীতলোজ্জ্বল প্রভাত!

কিন্তু ঘরের ভিতর সে দিন একটু পরেই একটা সন্ত্রস্ত আতঙ্কের ছায়া আসিয়া পড়িল। এতদিন ধরিয়া এত চেষ্টায় যোঝাযুঝি করিয়া যে শঙ্কা ব্যাকুল ভয়াবহ মুহূর্ত্তটা ক্রমাগত পিছাইয়া দিবার আয়োজন করিয়া আসা হইতেছে, আজ বুঝি তাহাকে আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, আজ বুঝি সকল শক্তিকে জয় করিয়া সে সদম্ভে আবির্ভূত হয়!

রোগী আজ ক্রমশঃ বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল, নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটী, যথা-সাধ্য বিস্ফারিত করিয়া বারম্বার সে সতৃষ্ণনয়নে যেন কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহার দীপ্তিহীন ম্লান মুখের উপর একটা তীব্র অধীরতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, ফ্লুরিণ আজ বড় ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহার অস্বস্তি আজ বড় বাড়িয়াছে, বড় বাড়িয়াছে—তাহাকে বুঝি আজ শান্ত করিতে পারা যায় না!

চিকিৎসক আসিলেন, পরীক্ষা করিলেন, তার পর গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেলেন। মর্ম্মপীড়িত পিতা হাতের উপর হাত রাখিয়া, নৈরাশ্যকাতর যন্ত্রণারঞ্জিত মুখে, নীরবে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মাতা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ভ্রান্ত আশায় স্ফীত বুকে একাদশী বাগানের বেড়ার কাছে রৌদ্রে

দাঁড়াইয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া হাই তুলিতেছে, এমন সময় দেখিল ছোট মেম সাহেব, বারেন্দায় টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া চোখে রুমাল দিয়া কাঁদিতেছেন, আর পিতা হাতে মাথা রাখিয়া ভয়ানক নিস্তব্ধ হইয়া, নিকটে চেয়ারে বসিয়া আছেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে একাদশীর মাথা ঘুরিয়া গেল, একটা অজ্ঞাত বিভীষিকা তীক্ষ্ণ শেলের মত অকস্মাৎ তাহার বুকে বিঁধিল, একাদশী ছুটিয়া আসিয়া ফ্লুরিণের ঘরে ঢুকিল।

একি চারিদিকেই, গভীর বিষাদময় হৃদয়ভেদী আতঙ্কের করাল ঢেউ! একাদশী কারো মুখপানে চাহিতে সাহস করিল না, কি জানি কি দেখিতে কি দেখিবে!

কঙ্কালসার দেহে ফ্লুরিণ শয্যার উপর ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, একাদশী একেবারে গিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল—"ফ্লুরিণ ফ্লুরিণ, দাদা আমার।"

মুহূর্ত্তমধ্যে ফ্লুরিণ স্থির! কষ্টে ফিরিয়া একবার চাহিল, কিন্তু হায় চিনিতে পারিল না, আবার মুখ ফিরাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

উঃ এক ঘণ্টা হয় নাই, সে এ ঘর হইতে বাহিরে গিয়াছে, এই অল্প সময়ের মধ্যে একি ভয়ানক অবস্থান্তর! একাদশীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, সে শয্যার প্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

যন্ত্রণাপীড়িত বিকৃতস্বরে ফ্লুরিণ ডাকিল "মা—"

"কেন ফ্লুরিণ কি বল্‌ছ?" মা মুখের কাছে সরিয়া আসিলেন।

"একাদশী কই মা?"

"দাদা ভাই কোথা আমার! এই যে আমি!"—একাদশী মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে আর কি!—পিছন হইতে কে ধরিয়া ফেলিল।

ফ্লুরিণের যন্ত্রণা-স্তিমিত মুখে একটু ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল!

এইবার সে চিনিয়াছে!—"মা আমার পিস্তল,—সেই পিস্তল, ঐ আলমারীতে আছে মা, একটীবার দাও!"

মা চোখ মুছিতে মুছিতে পিস্তল আনিয়া দিলেন, শ্লথ দুর্ব্বল হাতে ফ্লরিণ সেটাকে একবার তুলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। হাত কাঁপিতে লাগিল, ক্লান্তভাবে ডাকিল—"একাদশী, একাদশী।"

উচ্ছ্বসিত কাতরতায় ব্যাকুল একাদশী বলিল, "কি হয়েছে ফ্লরিণ,—কি কষ্ট হচ্ছে বল না ভাই!"

"বুঝ্‌তে পার্‌ছি না একাদশী, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, কিন্তু—বড় যাতনা!—" ফ্লরিণের চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, একাদশী আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল!

ঘর্ম্ম-শীতল, মৃদু-কম্পিত শিথিল হাতখানি একাদশীর হাতের উপর রাখিয়া ফ্লরিণ কিছুক্ষণ নীরবে রহিল, কিছু বলিতে চেষ্টা করিতেছিল, পারিতেছিল না। ধারার পর ধারা বহিয়া অশ্রুস্রোত নিঃশব্দে উপাধান সিক্ত করিতেছিল! উঃ কি নিদারুণ অবস্থা!

"একাদশী?"

"দাদা।"

বড় করুণ নিস্তেজ স্বরে ফ্লরিণ বলিল, "আমার তো কিছু নেই একাদশী, তুমি এই পিস্তলটা নাও,—আমার চিহ্ন—শেষ উপহার!"

একাদশী পাগলের মত আছড়াইয়া পড়িল। মরণাতুর ফ্লরিণের চোখ ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল, একটা গভীর মর্ম্মভেদী কোলাহলে সারা বাড়ীখানা মুখর হইয়া উঠিল।

৬

সমস্ত দিনটা কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিল কেহ সংবাদ লইল না। সন্ধ্যার পর সাহেব যখন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ী ঢুকিতেছিলেন তখন দেখিলেন স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় একাদশী ধীরে ধীরে কুঠীর বাহিরে আসিতেছে, তাহার মুখখানা পাথরের মূর্ত্তির মুখের মত অচঞ্চল ভাবহীন; দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বল; বুকের স্পন্দনও বুঝি অস্বাভাবিক ক্ষীণ!

সাহেবকে দেখিয়াও একাদশী অভিবাদন করিল না, যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিয়া যায় দেখিয়া সাহেব তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। স্নেহময় স্বরে ডাকিলেন—"একাদশী।"

অকস্মাৎ সুপ্তোত্থিতের মত একাদশী চমকিয়া উঠিল! অর্থশূন্য দৃষ্টিতে নীরবে তাঁহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল, কিছু বলিল না।

সাহেব আবার ডাকিলেন,—আবার ডাকিলেন, তথাপি একাদশী নিস্তব্ধ, অবিচল! সাহেব তাহার হাত ধরিয়া কুঠীর ভিতর টানিয়া লইয়া চলিলেন।

ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া হঠাৎ যেন একাদশীর চমক ভাঙ্গিল; সজোরে হাত টানিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সতর্ক সাহেব তখনই তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, "কোথা যাচ্ছ একাদশী, মেঘ করে আস্‌ছে, কাল সকালে তোমার ভাইয়ের কাছে যেয়ো।"

ভগ্ন স্খলিত-কণ্ঠে একাদশী বলিল, "ভাই, সমুদ্রের ধারে একলাটি ছোট ছেলে ঘুমুচ্চে, মেঘ আস্‌চে, ছাড়ো সাহেব আমি সেখানে যাই।"

"পাগল"—সাহেব বলপূর্ব্বক তাহাকে টানিয়া ঘরে আনিলেন, একটা চৌকির উপর তাহাকে বসাইয়া কত কথা বুঝাইলেন। একাদশী ডান হাতের উপর মাথা কাত্‌ করিয়া—অন্য হাত গালে দিয়া বিহ্বলের

মত তাঁহার মুখপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল ; সে কিছুই বুঝিল না।

তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলেরই কষ্টের উপর কষ্ট বাড়িয়া গেল। একে একে সকলেই তাহাকে কত সান্ত্বনা দিল কিন্তু একাদশী কাহারো কথার কিছু জবাব দিল না।

অবশেষে সাহেব বলিলেন, "আর ওয়ালটেয়ার ভাল লাগছে না, চল একাদশী আমরা ওয়ালটেয়ার ছেড়ে যাই।"

আহত ভুজঙ্গের ন্যায় একাদশী লাফাইয়া উঠিল। কথাটা বিদ্যুদ্দৃপ্ত সূক্ষ্ম স্পর্শের মতই তাহার অসাড় প্রাণটাকে সজোরে আলোড়িত করিয়া তুলিল। বুকভাঙা কাতরতায়, প্রাণভরা বেদনায় একাদশী চীৎকার করিয়া উঠিল, "থামো সাহেব থামো, ও কথাটি বোলো না, ফ্লরিণকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না!"

৭

পরদিন সকালে কেহ আর শোকোন্মত্ত একাদশীকে খুঁজিয়া পাইল না।

উদ্বেগ-কাতর সাহেব সমুদ্রের ধারে, বড় রাস্তায়, বাগানে, সহরের অলি-গলি—এমন কি তাহার ভাইয়ের বাড়ীতে পর্য্যন্ত লোক পাঠাইলেন। কুঠীর সকলেই শশব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিল; সাহেব নিজেও গোরস্থানের দিকে চলিলেন—কি জানি, যদি সেখানে গিয়া থাকে।

পূর্ব্ব রাত্রের বৃষ্টি-বারি-ধৌত বৃক্ষলতা, পত্র পুষ্প সকল তরুণ লাবণ্যে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণোদ্ভাসিত হইয়া হাসিতেছে। বিরাট সমাধি-ক্ষেত্র নিস্তব্ধ। সাহেব দ্রুতপদে গোরস্থানে ঢুকিলেন। উদ্বিগ্ন নয়নে চারিদিক চাহিতে চাহিতে চলিয়াছেন, দূর হইতে দেখিলেন—ঐ ফ্লরিণের

কবর! হাঁ তাই ঠিক! কবরের গায়ে মাথা রাখিয়া, ভিজা মাটির উপর ঐ যে কে একজন অসাড়ে ঘুমাইতেছে! কি চমৎকার নিশ্চিন্ত মুখ! সাহেব বেগে ছুটিলেন।—"একাদশী—একাদশী!"

একাদশীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ধড়ফড়্ করিয়া উঠিয়া ব্যাকুলভাবে সে কবরের দিকে চাহিল। "নাঃ ফ্লুরিণ ঠিকই আছে, যাক্ বাঁচা গেল।" আশ্বস্তভাবে অতি যত্নে অতি সন্তর্পণে সে কবরের মাথার দিকটা চাপড়াইতে লাগিল।

সাহেব রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "একাদশী!"

মা যেমন ছেলের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিবার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন, একাদশীও তেমনি হইয়া উঠিল, মুখ ফিরাইয়া বিরক্তভাবে চাপা গলায় সে বলিল, "কি, এখানে কেন?"

"তুমি আর এখানে কেন একাদশী? এখানে পড়ে থেকে আর কি করবে?"—

"কি করবে?" একাদশী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন অদ্ভুত আশ্চর্য্য প্রশ্ন সে যে জীবনে কখনো শুনে নাই! তাহার যা-কিছু কাজ করিবার আছে তাহা তো এইখানেই!—এমন সোজা কথাটা ইঁহারা কেহই বুঝিতে পারিলেন না!—কি নির্ব্বুদ্ধিতা!

বেদনা-পীড়িত স্বরে সাহেব বলিলেন, "অনর্থক এসব পাগলামি করে কোনো ফল নেই, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারুর ক্ষমতা চলে না।"

"ঈশ্বর!" অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে একাদশী একবার আকাশ-পানে চাহিল। "বেশ সাহেব, তবে তোমরা চলে যাও, আমায় জ্বালাতন কোরো না...আমার ফ্লুরিণ এখানে আছে, আমিও থাকবো।"

সাহেবের চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল, "অন্ধ ভ্রান্ত, ফ্লুরিণ কি আর এ জগতে আছে? সে যে এ জগৎ ছেড়ে চলে গেছে!"

সহসা একাদশী গর্জ্জিয়া উঠিল! "মিথ্যাবাদী নিষ্ঠুর!"—ইহারা সকলে মিলিয়া শত্রুতা সাধিতে চায়! তাহার শান্তির অবলম্বনটুকু চূরমার করিবার জন্যই ইহাদের সকলের চেষ্টা! কি ভয়ানক! যাও, সে কাহারো কথা শুনিতে চাহে না, তাহার ফ্লরিণ এইখানেই আছে!—একাদশী কবরের উপর বুক দিয়া প্রাণপণে মৃত্তিকা আঁকড়াইয়া ধরিল।

বিষাদ-মথিত হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সাহেব পাশে বসিলেন। "একাদশী তোমার মন বড় খারাপ হয়েছে, বুঝ্‌তে পার্‌ছি চল বাবা তোমায় নিয়ে এ দেশ ছেড়ে অন্য জায়গায় যাই।"

তীরবেগে একাদশী উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার সেই উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদের হাসি! "ওঃ! বুঝেছি সাহেব আমাদের দুটোকে তফাৎ করাই তোমাদের মতলব, আর কিছু না! কিন্তু সেটি হবে না!——

ঝটিতি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া, একাদশী মুখে তাহার নল পূরিল, মুহূর্ত্তে ঘোড়া টিপিল!

হাঁ হাঁ করিয়া সাহেব উঠিতে-না-উঠিতে দড়াম্ করিয়া আওয়াজ হইয়া গেল! একাদশীর প্রাণহীন দেহ কবরের উপর লুটাইয়া পড়িল! সারা কবরটা রক্তে রক্তময়——টক্‌টকে লাল হইয়া সূর্য্য-কিরণে ঝলসিয়া উঠিল!

স্তম্ভিত সাহেব মুহ্যমান নিস্পন্দ!

যে শূন্যগর্ভ মারাত্মক উপহার ফ্লরিণ স্নেহশীল সুহৃদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল, যন্ত্রণা-উন্মাদ সুহৃদ তাহাতে বজ্রানল ভরিয়া সযত্নে বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল! কেহই জানিতে পারে নাই।

ননী খানসামার ছুটি যাপন

১

বর্ষাকাল; সমস্ত দিনই ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। থাকিয়া থাকিয়া এক একবার বৃষ্টি ধরিতেছিল বটে, কিন্তু তাহা পুনর্বর্ষণেরই নবোদ্যম সূচনা জন্য। সমস্ত আকাশটা বৃষ্টি-সম্ভাবিত 'আমানি' মেঘে ধূসরমলিনতায় লিপ্ত হইয়াছিল। মাঝে মাঝে হু হু রবে এক একটা দমকা বাতাস, শীতকম্পিত ওষ্ঠে আকুল হুঙ্কার ছাড়িয়া যাইতেছিল। সদ্য-বিগত গ্রীষ্মের তপ্ত-আলিঙ্গন-মুক্তা বিশ্বপ্রকৃতি, এখন যেন নীরবে, নিশ্চিন্ত আরামে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া বর্ষার জলে স্নান করিতেছে।

মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিয়া, বাম হাতে জুতা ও ছাতা লইয়া এবং ঘাড়ে রঙীন টিনের ট্রাঙ্কসহ বিবিধ দ্রব্য-সামগ্রীপূর্ণ প্রকাণ্ড মোট বহিয়া, বলিষ্ঠ যুবক ননী হাজরা বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে সদর ঘাটে আসিয়া নৌকাযোগে নদী পার হইয়া, চারি ক্রোশ পাকা রাস্তা হাঁটিয়া যখন তাহার নিজ গ্রামে যাইবার মেঠো পথে 'আলের' মাথায় নামিল, তখন বেলা প্রায় পড়িয়া গিয়াছে।

সমস্ত দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা ও সুদীর্ঘ পথশ্রমে, ননীর সেই অসুরের মত কঠিন শক্ত দেহই যেন কাবু হইয়া আসিয়াছিল। বিশেষতঃ মাঠের পথে নামিয়া, পিচ্ছিল কর্দ্দমাক্ত আইলের উপর দিয়া সাবধানে সতর্ক পদক্ষেপে চলিতে চলিতে, তাহার পা দুইটা যেন ক্লান্তিতে অবশ হইয়া পড়িতেছিল, —কিন্তু হায়, তখন পায়ের খবর কে রাখে? ননী সামনের দিকে চাহিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে, নবোদ্যমে চলিতে লাগিল।

ছাতা এবং জুতা মাঝে মাঝে হাত বদলাইয়া বহন করার জন্য হাতে সে বিশেষ কিছু ক্লান্তি অনুভব করে নাই, কিন্তু ঘাড়ের মোটটা তো সেরূপ ভাবে বহন করিবার সুবিধা ছিল না। কাজেই, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড হইতে ঘাড়ের সমস্ত অংশ ব্যাপিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।—পথে আসিতে আসিতে ননী অনেকবার ভাবিয়াছে যে এইবার কোন একটা চটিতে বা গাছতলায় মোট নামাইয়া একবার একটু বিশ্রাম করিয়া লইবে, তারপর পুনশ্চ চলিবে,—কিন্তু পরক্ষণেই বাটী পৌছান'র বিলম্ব কল্পনা করিয়া সে সমস্ত আরামের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছে! —'নাঃ, মরিয়া বাঁচিয়া যেরূপেই হউক যদি একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে বাটী পৌছান যায় তো একমুহূর্ত্ত পরে গিয়া কাজ নাই, আরাম-স্বস্তির লোভ মাথায় থাক', এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনকে শক্ত করিয়া ছুটিতে ছুটিতে ননী সারাপথটা এড়াইয়া আসিয়াছে।—প্রতি পদক্ষেপেই সে ক্লান্তি পীড়িত মনকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছে—'আর কি, এইবার তো পথ ফুরাইল!'"

বৈকালে মেঘাচ্ছন্ন মলিন আলো ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। বৃষ্টি ফিন্ ফিন্ করিয়া পড়িতেছিল। কোনরূপে মাঠের পথ পার হইয়া ননী যখন গ্রামের পথে আসিয়া উঠিল,—তখন সহসা আবার সজোরে ঝম্ ঝম্ করিয়া জল পড়িতে আরম্ভ হইল! ননী প্রমাদ গণিল,—এইবার বুঝি কোন গৃহস্থ-বাড়ীর দাওয়ায় উঠিয়া আশ্রয় না লইলে চলে না, বড় জোর বৃষ্টি আসিয়াছে।—কিন্তু বাড়ী পৌছাইতে যে বিলম্ব হইবে! ভাবিল, নাঃ থাক, এতটা পথ যখন আসিয়াছি তখন এইটুকুতে আর মরিব না!—ননী হন্ হন্ করিয়া চলিল, বৃষ্টির ছাটে পথ ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না, তথাপি সে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, ছুটিল।

২

পশ্চিম পাড়ায় ননীর বাড়ী। বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে আসিয়া, দ্বার ঠেলিল,—দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। ননী উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, "চারু, চারু—ওরে চারু, কবাটটা খুলে দে!"

চারুচন্দ্র ননীর একমাত্র ছোট ভাই, এই ভাইটি ছাড়া তাহার আর কোন সহোদর বা সহোদরা নাই। ননীর জননী এই দুইটি সন্তান লইয়া বিধবা হইয়াছিলেন, তারপর অনেক দুঃখ ধান্ধা করিয়া বিধবা রমণী ছেলে দুইটিকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন—এখন দুই ছেলে রোজগারী হইয়া সংসারটা বেশ গুছাইয়া লইয়াছে। বড় ননীলাল বিদেশে মাসিক আট টাকা মাহিনার চাকরীতে, বখ্‌শীস ও পার্ব্বণী প্রভৃতি বাবদে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। ছোট চারুচন্দ্র বাড়ীতে থাকিয়া চাষ আবাদ করিয়া সম্বৎসরের ধান, কলাই ও গুড়টা জুটাইয়া লইতেছে। মাস কতক হইল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এক সমশ্রেণীর উগ্রক্ষত্রিয় গৃহে তাহার বিবাহ হইয়াছে। ননীর বিবাহ তৎপূর্ব্বেই হইয়াছে—এখনও বধূর সন্তান হয় নাই।

ননীর আহ্বানের উত্তরে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, সে আবার চীৎকার করিয়া ডাকিল। পরক্ষণেই ভিতর হইতে হড়াশ্‌ করিয়া হুড়কা খুলিয়া, ঘোমটা পরা একটি সুশ্রী শ্যামবর্ণ তরুণী ব্যগ্র বিস্ময়ে ঝুঁকিয়া উঁকি দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে যুবতীর মুখে একটা আকস্মিক আনন্দের ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিল,—ননী সস্মিত বদনে বলিল, "আমি,—দোর খোল।"

দ্বার মুক্ত হইল,—মোট মাথায় ননীলাল হেঁট হইয়া সাবধানে ছোট চৌকাট পার হইয়া, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল; বলিল, "চারু মাঠ থেকে এসেছে?"

"এসেছিল, ফের বেরিয়ে গেছে।"

"মা কোথা ?"

"মা গোপালপুরের খুড়ীর বাড়ী গেছে।"

"দাঁড়িয়ে ভিজো না, দোর বন্ধ করে দাওয়ায় এস"—বলিয়া ননীলাল অগ্রসর হইল। পত্নী সুষা দ্বার ভেজাইয়া দিয়া স্বামীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। ননী রোয়াকে উঠিয়া হাতের জুতা জোড়াটা এক পাশে ফেলিয়া, ইতস্ততঃ চাহিয়া বলিল, "তাইত, চারু বাড়ীতে নেই,—মোটটা—"

"তুমি একটু হেঁট হও না, আমি ধরে নামাচ্ছি।"

"পারবে ? ভারি মোট কিন্তু।"

"তা হোক ; দেখিই না।"

ননী হেঁট হইল, দুইজনে ধরাধরি করিয়া মোটটা নামাইল ; সে তখন একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্লান্তভাবে খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িয়া, ঘাড়ের পিছনে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "ওঃ ঘাড় ফেরাতে পাচ্ছি না,—আড়ষ্ট হয়ে গেছে। ছ ঘণ্টা মোটটা ঘাড়ে বইছি, সাধারণ কথা, বাপ্! তুমি পার ?"—বলিয়া ননী পত্নীর মুখপানে চাহিয়া পরিহাস ভরে একটু হাসিল।

সুষা সে কথায় কান দিল না। আগ্রহান্বিত মুখে প্রশ্ন করিল, "তুমি কটার গাড়ীতে এসেছ ? সারাদিন কিছু খাওনি ?"

"না, কিছু খেয়েছি। বর্দ্ধমানে নতুনগঞ্জের বাজার থেকে জলটল খাবার কিনে খেয়েছি। ইচ্ছে করলে হোটেলে ভাত পেতুম,—কিন্তু মোট বইতে হবে বলে তা আর খাইনি।"

"পা ধুয়ে এস, তামাক সেজে দিই—"

"না না, তামাক থাক, পকেটে বিড়ি আছে তাই খাচ্ছি।"—বলিয়া ননী পকেট হইতে বিড়ি ও দেশালাই বাহির করিল,—কিন্তু দেশালাইটা

জলে ভিজিয়া গিয়াছিল, জ্বলিল না। ননী দাঁতে বিড়ি চাপিয়া, ব্যর্থ চেষ্টায় দেশালাই কাঠি বাক্সটার গায়ে ঘসিতে ঘসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে দেশালাই আছে ?"

"আছে—দিই"—বলিয়া সুষা ঘরে ঢুকিয়া শয্যা-নিম্ন হইতে দেশালাই বাক্স বাহির করিয়া আনিয়া ননীকে দিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমি যে ভদ্দর নোক হয়ে পড়েছ, এখন আর তামাক খাও না ?"

"ভূতের আবার জন্মবার !—বারমাসই হল ঘুরে বেড়ান, তামাকের সরঞ্জাম কত সঙ্গে করে ঘুরি বল !"—বলিয়া ননী দেশালাই জ্বালিয়া বিড়ি ধরাইয়া টানিতে আরম্ভ করিল।

"আচ্ছা তুমি ক'টার সময় বর্দ্ধমানের ইষ্টিশানে এসেছিলে ?"

"বেলা দশটায়।"

"তোমার মনিব যে এখন তোমায় ছেড়ে দিলেন! সে দিন ঠাকুরপো বল্লে, চিঠিতে তুমি নিকেছ যে এখন তুমি মনিবের সঙ্গে খড়্গপুর যাবে, এখন আর আসবে না, সেই পূজোর পর তবে। তা হ'লে কি রকম হ'ল ?"

"মনিবের খুসী।"

"আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনে প্রথমে চম্‌কে উঠেছিনু।"

"ভেবেছিলে বুঝি আর কেউ এল ?"

"আহা, যাও।—আমি মনে করেছিনু বুঝি ঠাকুরপোই মিছি মিছি ফিরে এসে দুষ্টুমি করছে, শ্বশুরবাড়ী যায়নি—আমি ঠাট্টা করেছিনু কিনা, তাই ফিরে এসেছে!"

"চেরো শ্বশুরবাড়ী গেছে বুঝি ?"—বলিয়া মুখ হইতে বিড়ি নামাইয়া ননী পত্নীর মুখপানে চাহিল; সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "সে আজ আর বাড়ী আস্‌বে না ?"

"বাড়ী আবার আসবে কি !"

"শ্বশুরবাড়ীতে রাত্তির বাস ধরেছে বুঝি ?"

সলজ্জ স্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সুষা বলিল, "ধরবে না!" তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে অনেকখানি ওকালতির সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। ননী বিস্মিত হইয়া বলিল, "এর মধ্যে কি গো, ছেলেমানুষ !"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া অস্ফুটস্বরে সুষা বলিল—"কচি খোকা !"

ননী সে কথায় কান দিল না, অন্যমনস্কভাবে বিড়ি টানিতে টানিতে বলিল, "আচ্ছা, সে কদিন অন্তর শ্বশুরবাড়ী যায় ?"

"মাসে পাঁচ সাত দিন।"

"পাঁচ সাত দিন !—এইবার উচ্ছন্ন যাবে আর কি !"

"তুমি বোকোনা বাবু! শ্বশুরবাড়ী গেলেই মানুষ অমনি উচ্ছন্ন যায়! আর বউ যদি এখানে থাকৃত ?"

"থাকত, থাকতই; লাট সাহেব হত নাকি? এই যে আমি, বছরে ক'দিন এসে বাড়ীতে থাকৃতে পাই! তুমি বল্‌তে পার না?—তা তুমি বলবে কেন, তুমিই ত আস্কারা দিয়ে তার মাথা খাচ্ছ—বাস্তবিক, এখনকার ছেলেপিলেরা সব কি হ'ল গো!"

ব্যঙ্গস্বরে সুষা বলিল, "তুমি কবেকার গো? তুমি কি ছিলে ?"

"আমি!—কই আমার মুখপানে চেয়ে সত্যি করে বল দেখি আমি কি ছিলুম!"—ননী ঘাড় উচাঁইয়া পত্নীর পানে চাহিল।

"আমি জানি না, যাও!"—বলিয়া সুষা হাসিতে হাসিতে মুখ ফিরাইল। বলিল, "তা এখন ঘাট থেকে হাত পা ধুয়ে এসে কিছু খাবে, না বসে বসে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে ?"

নিঃশেষ-প্রায় বিড়িতে একটা দীর্ঘ টান দিয়া, জ্বলন্ত বিড়িটা উঠানে

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ননী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "গামছাটা দাও, জল ধরে এসেছে, ঘাট থেকে কাপড়টা কেচেই নিয়ে আসি—"

"আহা থাক না, আমি এর পর—"

"না না, কেন অনর্থক কষ্ট করবে, দাও আমিই কেচে আনি। কিন্তু সত্যি বলছি, চেয়ো কি অন্যায় কর্‌ছে ত্থাথ দেখি! এবার তাকে একটু কড়্‌কে দিয়ে যাব—"

"সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না কি?"

"সঙ্গে করে?"—চিন্তিত ভাবে ননী বলিল, "ত্থাথ, এ চাকরী পয়সার চাকরী বটে, যদি বুঝে চালাতে পারা যায়! কিন্তু সঙ্গ বড় খারাপ কি না, ঐ সব অবুঝ ছেলেমানুষকে এ সব মন্দ সঙ্গের সীমানায় যেতে দিলেই সর্ব্বনাশ হয়ে যায়। বিনোদ চাটুয্যে সবজজের ছেলে নীরদ চাটুয্যে মস্ত উকীল, তাঁর খাস খানসামা আমি, এ লোকের কাছে পরিচয় দিতেই ভাল। কিন্তু আসলের খবর যদি শোন, তো, আমার সে মেহনতের পয়সা ছুঁতে তোমাদের ঘেন্না করবে! বাপ্, সে সব জায়গায় কি জেনে শুনে আপনার লোককে ঢুক্‌তে দিতে আছে? একেবারে বয়ে যাওয়া, জাহান্নম যাকে বলে!"

"নিজে তো বারমাস তিরিশ দিন নিশ্চিন্দি হয়ে তাই কর্‌ছ?"

"এখন অভ্যাস দুরন্ত হয়ে গেছে, জাহান্নমের তোয়াক্কা আর বড় রাখি নে।"

"হ্যাঁগা তুমি যে বলতে তোমার মনিব মহাদেবের মত—"

"এখনও তাই, তুষ্ট থাকলে সদাশিব,—আর রুষ্ট হলে ব্রহ্মাণ্ডে আগুন ধরিয়ে দেবেন, একেবারে যমের বাবা বীরভদ্র!"

"ওগো কথা ছেড়ে ওঠ, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ থাক্‌বে?"

"যাই—যাই। ভাল কথা, মোটের ভিতর একতাড়া পাণ আছে দাও তো, ঘাট থেকে ধুয়ে আনুব।"

"কেন, আমার হাতে কি 'কুট' হয়েছে ?"

"ওগো তা হয়নি জানি। কিন্তু গোলামের ধাতে অত নবাবী বরদাস্ত হবে কেন ? আমার মনিব বাড়ীতে বলে, এর চাইতেও কত"......বাকী কথাটা উহ্য রাখিয়া ননী হেঁট হইয়া নিজেই মোট হইতে পাণের তাড়া বাহির করিয়া লইয়া ঘাটের উদ্দেশ্যে, দাওয়া হইতে নামিয়া খিড়কি দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। সুষা কয় মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তারপর একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল, স্বামীর পরিধেয় বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখিতে মনোনিবেশ করিল।

অল্পক্ষণ পরে ননীলাল ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিল। ধৌত পাণগুলা সুষার হাতে দিয়া বলিল, "গোটা কতক সাজ দেখি।"

"সাজছি, আগে তোমায় খেতে দিই, কি খাবে ? মুড়ি, চালভাজা, ছোলা ভাজা সব আছে, নারকেল আছে ভেঙ্গে দেব ?"

"না না এখন নয়, মা আসুক আগে, তা পর—মা তো এখুনি আসবে। ততক্ষণ একটু ভাল করে তামাক সেজে খাই, তুমি পাণ দাও।"

ননী চাকুর হুঁকা কলিকা লইয়া তামাক সাজিয়া, দেশালাইয়ে কাঠ-কয়লা ধরাইয়া হুঁকা টানিতে আরম্ভ করিল। সুষা পাণের বাটা চূণের ভাঁড় প্রভৃতি ঘর হইতে বাহির করিয়া—অদূরে বসিয়া পাণ সাজিতে লাগিল। ননীলাল সুখের আবেগে তামাক টানিতে টানিতে তাহার আকস্মিক আগমনের সুযোগ কেমন করিয়া ঘটিল, তাহারই কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার মনিব মেদিনীপুর হইতে কার্য্যোপলক্ষে আসানসোলে আসিয়াছিলেন, সেখান হইতে ফিরিবার

পথে সে কিরূপ কৌশলে তাহার অন্যতম সহযোগী মোহনচাঁদের মারফৎ মনিবের নিকট ছুটির আবেদন করাইয়া কার্য্যোদ্ধারে সমর্থ হইয়াছে, সে সমস্ত বলিয়া শেষে যখন তাহার বাড়ী আসার আগমন উপলক্ষে সহকর্ম্মীগণের ব্যঙ্গবিদ্রূপের কাহিনী বলিতে লাগিল,—তখন সুষা লজ্জারক্ত মুখে অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল,—"ছি ছি, শ্যাম বাবু। তোমরা বড়—ওর নাম কি, এ হয়েছে !"

বাড়ীর দ্বার ঠেলিয়া কে ভিতরে প্রবেশ করিল। সুষা তখন মাথায় কাপড় টানিয়া বধূ হইয়া বসিল। ননী চাহিয়া দেখিল মাতা আসিতেছেন, সে হুঁকা নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

৩

ননীর মাতা রোয়াকের পৈঠায় উঠিতে উঠিতে বিস্ময় আনন্দপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"তুই কতক্ষণ এসেছিস্ ?"

ননী মাতার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া, দুই হাতে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া ললাটে বক্ষে ও জিহ্বায় দিল। হাসিমুখে বলিল, "এই খানিকক্ষণ আসছি। তোমার শরীর বেশ ভাল আছে মা ?"

মাতা পুত্রে স্বাগত প্রশ্নাদি বিনিময় অন্তে অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আলাপ হইল। মাতা ননীর আহারাদির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "সমস্ত দিন ভাত খাসনি ? তা হলে এখুনি উনুন জ্বেলে দুটী ভাতে ভাত চাপিয়ে দি। ওবেলাকার ঝালের মাছ রান্না আছে, মৌর... মাছের টক আছে, সন্ধে হলে সকাল সকাল খেয়ে নিবি। এখন তা হলে দুটি জল খা—"

"চাল ভাজা আছে বলছিল না ?—দাও না তাই খাই, অনেকদিন ওসব খাইনি,—মুড়িই খেতে পাই না, তার আর—"

ইতিমধ্যে বধূর পাণ সাজা হইয়া গিয়াছিল, সে একটা পিতলের রেকাবী করিয়া গোটাচার পাণ আনিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর হাতে দিল। স্বামীর হাতে দিল না, কারণ গুরুজন নিকটে থাকিলে সেরূপ হাতাহাতি দেওয়াটা নিন্দাজনক অশিষ্টতার কাজ!—শাশুড়ী পাণ লইয়া বধূকে বলিলেন, "পাণ এখন থাক বাছা, আগে তুমি ননীকে জল খেতে দাও। চারুর সেই রেকাবীটে করে দুটি চালভাজা তেল মেখে দাও। আর কাঁচা লঙ্কা আছে, দেবে রে ননী?"

"দিক না।"

"তবে দাও, হেঁসেল ঘরে বেদীর ওপর লঙ্কা আছে। সেইখানেই কাটারীটে আছে, নিয়ে আয়ত বাছা, মাচায় নারকেল আছে পেড়ে দিই।"

"আমায় বল না কোথায় আছে, পেড়ে নিচ্ছি"—বলিয়া ননী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"না থাক আমি নাগাল পাব।"

"হ্যাঁ মা, চেরো শ্বশুর বাড়ী গেছে?"

"তোকে কে বল্লে?"—মাতার কণ্ঠস্বর একটু খাটো হইয়া গেল। ননী নখে মাটী খুঁটিবার ছলে হেঁট হইয়া রান্নাঘরের দিকে গোপন দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল সেখান হইতেও একজন প্রচ্ছন্ন হাস্যভরা মুখে, কৃত্রিম কোপব্যঞ্জক কটাক্ষে তাহাকে নিঃশব্দ ভৎর্সনায় শাসন করিতেছে! তাই সহজ ভাবে হাসিয়া বলিল—"আর কিছুর জন্যে নয়, তবে কি না চাস বাসের সময় অনর্থক—"

মাতা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না না, তা সেখানে একটি দিনও কামাই করে থাকে না। ভোর না হতেই চলে আসে। রাত থাকতে আসার জন্যে আমি বরং কত বকে মরি—"

বধূ রান্নাঘর হইতে চালভাজায় তৈল মাখাইয়া কাঁচা লঙ্কা ও গুড়সহ

এক ঘটি জল লইয়া আসিয়া শ্বাশুড়ীর নিকটে নামাইয়া দিল। শ্বাশুড়ী ঘরে ঢুকিয়া মাচার উপর হইতে নারিকেল পাড়িয়া লইয়া আসিলেন; ননী নারিকেল ভাঙ্গিয়া কাটারির দাগ করিয়া মালা হইতে নারিকেলের শস্য ছাড়াইতে ছাড়াইতে হেঁট মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "চারুর শরীরটা এখন সেরেছে মা? একটু মোটা সোটা হয়েছে?"

"কই আর! তেমনিই রোগা আছে। আর বাবা, যে খাটুনী পড়েছে মাঠে—"

"হুঁ"—ননী খানিকটা নারিকেল ছাড়াইয়া লইয়া বাকীটা সরাইয়া দিয়া বলিল, "রেখে দাও মা, রাত্তিরে তোমার মুড়ি খাবার সময় ছাড়িয়ে দেব।"

"তুই আর একটু নে।"

"না, আমি ঢের নিইছি"—বলিয়া ননী জলযোগ করিতে বসিল; উঠানে ও-পাশে গোয়াল ঘরের চালার দিকে চাহিয়া বলিল, "হেলে দুটোকে চারু খড়-জাব দিয়ে গেছে?"

"সে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে গেছে। আহা দেখ ননী, এবার বক্না বাছুরটি যা হয়েছে, বড্ড পরিষ্কার! ঠিক ওর মার মত।"

"ক দিনের হ'ল মা?"

"ও মাসের দশরার দিন হয়েছে, আর আজ মাসের পনেরুই, এই ঠিক একমাস পাঁচ দিন।"

"দুধ কতটা করে দ্যায়?"

"দু বেলায় প্রায় আড়াই সের। ডেড়সের করে বাঁড়ুজ্যেদের রোজ দিই, আর এক সের করে ঘরে রাখি। তিন মনিষ্যির ঢের হয়, আর ঐ দুধের দামে খোল ভুষী কিনি, রাখালের চরাণী পয়সা দিই।—হ্যাঁরে তুই সেখানে দুধটুধ পাস?"

"দুধ বড় একটা পাই নে, তবে অন্য পাঁচ সামিগ্রীর তো অভাব নেই—"

"আহা তাত বটেই বাবা, সে হ'ল রাজার ভাণ্ডার! তা হ্যাঁরে ননী, মনিবরা যত্ন ছেদ্দা করে? ভালটাল বাসে কেমন?"

চালভাজা চিবাইতে চিবাইতে লঙ্কায় কামড় দিয়া ননী বলিল, "চাকরকে ভালবাসা, মা, কাজের খাতিরে। গা ঘামিয়ে, প্রাণ উচ্ছুগ্যু করে যতক্ষণ খাটব, ততক্ষণই আদর, তার পর একটু এদিক ওদিক হলে পাঁচ বছরের ছেলেটিও চোখ রাঙিয়ে ঝেঁপে উঠবে। তবে আমায় বড় একটা কেউ কিছু বলবার বাগ পায় না,—আমি ত গতর রেখে খাটি না। আমি হামেহাল খাড়া থাকি, দিনকে দিন বলি না, রাতকে রাত বলি না। ধর, দুপুর রাত্রে খেটে খুটে শুইচি, হয়ত তন্দ্রাটি এসেছে, এমন সময় বাবু ডাকলেন। তক্ষুণি উঠে পড়নু। ঘুমে চোখে দেখতে পাচ্ছিনা—চোখে এক ঝাপ্‌টা জল দিনু, বাবুর ঘরে গেনু—হয়ত বল্লেন সোডা ভেঙ্গে দে। সোডা ভাঙ্গনু, গেলাসে ঢালনু, বাবুর খাওয়া হ'ল, তার পর চুরুট ধরিয়ে দিনু—তবে ছুটি। আবার সেই ভোর পাঁচটা হোতে না হোতে এক ডাকে উঠে কাযে লাগতে হবে। পয়সা কি আর অম্নি হয় মা!"

"আহা তা নয় বাবা!"—দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সকরুণ ছল ছল নয়নে মাতা পুত্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ননী একটু সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল যে, পুত্রের দাসত্ব জীবনের এই সমস্ত দুঃখ-কাহিনী মাতার পক্ষে মোটেই আনন্দদায়ক নহে। আবার—ননী উৎ-কর্ণ হইয়া শুনিল, গৃহ মার্জ্জন-রত আর একজনের ঝাঁটার শব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—সম্ভবতঃ সেও কাণ ঠাড় করিয়া তাহার কথা শুনিতেছে। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা উল্‌টাইয়া লইয়া ননী বলিল, "আমি এখন খুব মোটা হইচি, নয় মা?"

"কি যে খুঁড়িস বাবু! কোথায় মোটা হইচিস?"

"না মা, মোটা হইচি বই কি। এবার অনেক ভাল ভাল জায়গা বেড়িয়ে এনু কি না কটক—পুরী।"

"দক্ষিণ গিয়েছিলি? জগবন্ধু দর্শন করে এলি?"

"জগবন্ধু দেখা হয় নি বটে, তবে দূর থেকে মন্দিরটে দেখে এসেছি।"

"ওমা! জগবন্ধু দেখলিনে কিরে?"

"ফুরসুৎ পেনু না মা। সাতদিন ছিনু বটে, কিন্তু হলে কি হবে, চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কখন কি হুকুম হয়। আর, আমার মনিব সায়েবী মেজাজের লোক, ওসব মোটেই মানেন না। একদিন এক পাণ্ডা দেখা করতে এসেছিল, ওরে বাবা, তাকে যা করে উঠেছিলেন! আমরা বলি এইখানেই বুঝি নিকেশ হ'ল—"

"হ্যাঁরে, ওঁরা ও সব মানেন না কেন?"

"ওরা মানে উনিই; মেয়েদের তো ঠাকুর দেবতায় ভক্তি ছেদ্ধা আছে। উনি বলেন, আমি যতক্ষণ ঠাকুর দেখব ততক্ষণ আমার বিলিয়ার্ড খেলা হবে, বিলিয়ার্ড খেলা সে এক রকম সায়েবী খেলা, তুমি মেয়ে মানুষ বুঝবে না।"

ননী উঠিয়া ছাচার জল বহিবার নালীর কাছে গিয়া ঘটীর জলে হাত ধুইয়া, ঢক্ ঢক্ করিয়া জল খাইল। তার পর ঘটীটা নামাইয়া রাখিয়া মাতার নিকট হইতে পাণ লইয়া মুখে পূরিল।

বধূ বিছানা ঝাড়িয়া ঘর দ্বার ঝাঁট দিয়া সমস্ত ওজ্‌লা জড় করিয়া বাহিরে আসিয়া উচ্ছিষ্টপাত্রে ফেলিয়া, সেই বাসনগুলা সব গুটাইয়া লইয়া, দাওয়ায় গোময় লেপন করিয়া দিল। তার পর রান্না ঘর হইতে ঘড়া ও ঘটী বাহির করিয়া উঠানে রাখিল। ননীর মাতা পুত্রকে বলিলেন, "তুই তা হলে বসে থাক, আমরা কাপড় কেচে আসি।"

"যাও।"—বলিয়া ননী তামাক সাজিতে বসিল।

৪

গা ধুইয়া আর্দ্র বস্ত্রে জলপূর্ণ কলস লইয়া বধূ যখন বাড়ী ঢুকিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। দাওয়ায় উঠিয়া বধূ দেখিল, ইতিমধ্যে দীপ জ্বালা হইয়াছে, এবং দীপালোকের নিকট বসিয়া ননীলাল রাশীকৃত ফুল লইয়া সূচ সূতায় নিবিষ্টচিত্তে মালা গাঁথিতেছে। ননী পদশব্দ পাইয়া মুখ ফিরাইল, বধূর হাস্যরঞ্জিত মুখপানে চাহিয়া বলিল, "বসে থাকি না ব্যাগার খাটি। একটা হাস্নু হেনার চারা এনেছিনু, পাঁদাড়ে পুঁতে দিতে গেনু, দেখি বিস্তর যুঁই আর বেলফুল ফুটে রয়েছে, চাট্টি তুলে নিয়ে এনু। আহা সহর বাজার হ'লে এই ফুলগুনির দাম চার আনা তো বটেই!"

"তা কুঁড়িগুনো তুলে এনেছ কি কর্ত্তে?"

"কুঁড়ি নয়, এগুনো ফোটবার মুখী হয়েছে। এই যুঁইয়ের কুঁড়িতে মালা গেঁথে জলে ভিজিয়ে রাখলে সন্ধ্যার পর এ একেবারে টোপ্পর হয়ে ফুটে উঠবে দেখো। দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, কাপড় ছাড়। মা কই?"

"মা রাত্তিরে খুড়ীর কাছে শোবে, তাই বলতে গেছে।"

"ওঃ"—ননী দুই মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "তাইত একবেড়ে ঘরে আর চলছে না। মরে বেঁচে যা করেই হোক এবার অন্ততঃ একখানা ঘরও তুল্‌তে হবে।"

"না তুল্লে চলবে কেন? দুদিন পরে, ধর, ছোট বৌটি আসবে। আজ না হয় ঠাকুরপো দত্তদের বৈঠকখানায় শুচ্ছে, এর পর তো আর তা হবে না।"

"তাত বটেই। আর ঘর না হলে ঘরের লক্ষ্মী ঘরেও আন্‌তে পাচ্ছি না। যা করেই হোক, অঘ্রাণ মাসের মধ্যেই ঘরটা তুলে ফেলতে হবে।

মাঘ মাসে ছোট বউকে আনা হবে, আর বেশী দিন কি বাপের বাড়ীতে ফেলে রাখা যায়?"

"তাকি যায়? বিয়ের জল পেয়ে ছোট বউ মস্ত বড়টা হয়ে পড়েছে। রথের সময় মা এনেছিল, দেখলাম প্রায় আমার মত মাথায় হয়ে গেছে।"

"সত্যি নাকি? তা হোক, তুমি এখন কাপড় ছাড় দেখি।"

"দাঁড়াও উনুনে আগুনটা দিয়ে আসি, মাচা থেকে ঘুঁটে পাড়্তে হবে।"

"আচ্ছা আমি দিয়ে আসছি"—বলিয়া ননী ফুল মালা স্থচ স্থতা সব ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বধূ বিব্রতভাবে বলিল, "আঃ কি যে ছেলে-মানুষী কর, মা দেখলে এখুনি কি বলবে বল দেখি।"

"মাকে সে আমি বুঝিয়ে দেব, তুমি এখন কাপড় ছাড় তো"—বলিয়া ননী সত্য সত্যই রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। বিপন্না বধূ মিনতি করিয়া ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু ননী সে কথা কানে তুলিল না, রান্নাঘরে গিয়া মাচার উপর হইতে হুড় দাড় শব্দে ঘুঁটে নামাইয়া উনান ধরাইতে বসিয়া গেল।

অগত্যা বধূ কাপড় ছাড়িয়া, তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া, শঙ্খধ্বনি করিয়া, গোয়ালঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া, মশক-দংশনে বিক্ষুব্ধ গোরুগুলির জন্য একটু ধোঁয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সেখান হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় ননী রান্নাঘর হইতে ডাকিল, "উনুন ধরে গেছে গো!"

মাতা তখন বাড়ীর চৌকাঠ পার হইয়া উঠানে ঢুকিয়াছিলেন। তিনি রান্নাঘর হইতে পুত্রের আহ্বান শুনিতে পাইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "বউ কোথা? তুই ওখানে কেন রে?"

"একটু আগুন নিতে এসেছি"—বলিয়া ননী তাড়াতাড়ি রান্নাঘর

হইতে বাহির হইয়া আসিল। বধূ গোশালা হইতে দীপ হস্তে বাহির হইলে শ্বাশুড়ী একটু মিষ্ট ভৎসনার স্বরে বলিলেন, "আমি এসে গোয়ালে সাঁজালি দিতুম বাছা, তোমার এত তাড়াতাড়ি করা কেন! যাক, বেশ হয়েছে, তুমি এখন দুধটা আগে আউটে নাও, তাপর ভাতের হাঁড়ি আমি এসে চড়াচ্ছি।"

বধূ মাথা নাড়িয়া নীরবে তথাস্তু জ্ঞাপন করিয়া আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল; শ্বাশুড়ী কাপড় ছাড়িতে দাওয়ায় উঠিলেন। ননীলাল মাতাকে লওয়ার কৈফিয়ৎ দিলেও, বাস্তবপক্ষে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু চাড় না থাকায় আসিয়া আবার ফুলের মালা গাঁথিতে বসিল। মাতা বলিলেন, "তুই যে এখন ফুল নিয়ে বসলি ননী!"

"কি করব মা, একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই। চেরোটা বাড়ীতে নেই, যে দুদণ্ড পাঁচটা কথা কই। বাড়ী যেন খাঁ খাঁ কচ্ছে। এবার যে বাড়ীতে এসেছি তা যেন মোটেই বুঝতে পাচ্ছি না; তাই ভাবছি একবার হেরিকেনটা নিয়ে দুগ্‌গো ডাঙায় যাব কি?"

"না বাবা, এই রাত্তিরে! একে বর্ষাকাল, তাতে আওলের দিন, চাদ্দিকে বন বাদা,—কাল সকালেই তো সে আসবে।"

"তা'ত আসবেই—কিন্তু আজ"—কয়েকমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ননী সহসা বলিয়া উঠিল, "ভাল কথা মনে পড়েছে মা। ঐ ধামার মোটের মধ্যে পাঁচিশটে বোম্বাই আর পঞ্চাশটে ভুতো বোম্বাই আম আছে। আমাদের পাড়াগাঁয়ে তো ওসব ভাল আম চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, তাই নিয়ে এনু গোটাকতক। কাল ঠাকুরদের দুটো দিও, খুড়ীকে গোটা চার দিও আর এবাড়ী ওবাড়ী যাকে যা দিতে হয় দিও। কাশীর প্যায়রাও গোটাকত আছে, একটা একটা সব দিও। আর ছাখ মা,

ইষ্টিসনে নতুন বেগুন আর মূলো বিক্রি হচ্ছে দেখে, আট আনায় আধসের বেগুন আর মূলো কিনে নিয়ে এসেছি।”

“বেশ করেছিস্। আজ রাত্তিরে তা হলে মূলো বেগুনের একটু তরকারী হোক।”

“না না, সে তরকারী কাল দিনের বেলা হবে; তোমার শুদ্ধ হবে, চেয়ো থাকবে। আজ সে বাড়ী নেই, আজ ওসব তরকারী কেন? শুধু দুটি ভাতে ভাত ফুটিয়ে দিতে বল, খাব এখন।”

“তা হলেই বা।”

“না মা, আজ ওসব ল্যাটা কোর না। চেয়ো থাকলেও বা যা হোক হোত, কিন্তু শুধু আমার জন্যে—না, সে আমি খাব না। বিদেশে পাঁচ-পূজ্যির বাড়ীতে থাকি মা, সময় শিরে কত ভালমন্দ সামগ্রী খেতে পাই, কিন্তু সে সব মুখে তুলতে আমার মন কেমন করে।”—ননীর কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। মাতা মৃদুনিঃশ্বাস ফেলিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, “তা হোক, তুইত বাবা আমাদের কিছু অভাব রাখিস্ না, যখন বাড়ী আসিস্ তখন তো আশ পূরিয়ে সামিগ্‌গীরি আনিস্।”

বহুক্ষণ ধরিয়া এইরূপ নানা প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তা চলিল। তার পর ননীর আহার্য্য প্রস্তুত হইলে, পুত্রকে আহার করাইয়া মাতা নিজে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন এবং বধূকে আহারে বসাইয়া দিয়া প্রতি-বেশিনী গৃহে শয়ন করিতে চলিলেন। ননী আলো ধরিয়া তাঁহাকে দাঁড়াইয়া রাখিয়া আসিল।

সমস্ত দিনের ক্ষুধা ও শ্রমক্লান্তির পর দুইটি অন্ন উদরে পড়িতেই, গভীর নিদ্রায় ননীলালের সমস্ত দেহ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বিছানার উপরে সে দেহ ঢালিল। বধূর তখনও রান্নাঘর নিকান ও অন্যান্য খুচরা কাজ বাকী ছিল সে তাহাই

সারিতেছিল,—ননী চেষ্টা সত্বেও আর চক্ষু খুলিয়া রাখিতে পারিল না, ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পদতলে কাহার তপ্ত কোমল কর-সংঘর্ষণ অনুভব করিয়া 'ছ্যাৎ' করিয়া ননীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—অভ্যস্ত সংস্কার-বশে মনে হইল প্রভু বুঝি কক্ষান্তর হইতে ডাকিতেছেন। সে নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, "আজ্ঞে যাই।"

পরমুহূর্ত্তেই ত্রস্তভাবে ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। সহসা দীপালোকে পদপ্রান্তে উপবিষ্টা তরুণীমূর্ত্তি দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। তাহার তন্দ্রাঘোর ছুটিয়া গেল, বিস্ফারিত চক্ষে ভাল করিয়া চারিদিক চাহিয়া,—নাঃ, এত প্রভু-নিবাসের ধব্‌ধবে চূণকাম করা প্রকাণ্ড হলঘর নয়, এ যে তাহার নিজের সেই আবাল্যের পরিচিত গোময়লিপ্ত ক্ষুদ্র মৃৎকুটীর!—আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া দুই হাতে চোখ রগ্‌ড়াইয়া ননী বলিল, "ওঃ বড্ড ঘুমিয়ে গেছনু—তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

"এই ত আস্‌ছি। তুমি ঘুমুচ্ছ দেখে পায়ে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছিনু, তুমি শোও না।"

"না, আর ঘুম হচ্ছে না। থাক, পায়ে আর তেল দিতে হবে না, তুমি শোও, অনেকটা রাত হয়ে গেছে না?"

"না, রাত আর কই বেশী হয়েছে? তুমি শোও শোও, আমি পায়ে একটু তেল দিয়ে দিই। সমস্ত দিনটা পথ হেঁটে এসেছ!"

"তা হোক, ও সব বদ্ অভ্যেস কিছু দরকার নেই, ওসব কি আমাদের পোষায়? তুমি শোও, আমি একটু চোখে মুখে জল দিয়ে আসি"—বলিয়া ননী বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত আকাশ তখন মেঘশূন্য ও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। সেদিন শুক্লাদ্বাদশী, নির্ম্মল আকাশে তখন চন্দ্রদেব পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্যোৎস্না

ছড়াইতেছিলেন! বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী বন হইতে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত বনমল্লিকা ও রজনীগন্ধার মৃদু মধুর সৌরভ বর্ষার বাতাসে ধীরে ধীরে বহিয়া আসিতেছিল। চারিদিক একটা স্নিগ্ধ শীতলতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, সময়টা বড় মধুর বড় নিবিড় শান্তিপ্রদ মনে হইল। ননী গভীর আরামে আলস্য ভাঙ্গিয়া হাই তুলিয়া একটা নিগূঢ় তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল,—আঃ এই সুষুপ্ত রজনীতে এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তে ক্ষুদ্র বাড়ীখানার মধ্যে সে এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত! এই দুর্লভ আনন্দময় অবসরটুকুর মূল্য যে কত তাহা মর্ম্ম দিয়া উপলব্ধি করিতে পারে শুধু দাসত্ব-পীড়িত দরিদ্রের অন্তরাত্মা! যাঁহার অজস্র শক্তি স্বাধীনতা আছে, তিনি এ আনন্দের অবিকৃত আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন কি না তিনিই জানেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বিক্ষত দারিদ্র্যের বুক শুধু এই আনন্দের প্রলেপেই সান্ত্বনায় সুস্থ হইয়া উঠে—ইহাই তাহার অমৃত, ইহাই তাহার নির্জ্জীব অসাড়তায়—চেতনাসঞ্চারের মৃতসঞ্জীবনী, ইহারই বলে সে সমস্ত জীবনব্যাপী নিন্দা তিরস্কার দুঃখ বেদনা অপমান লাঞ্ছনা হাসিমুখে বুক পাতিয়া লইয়া দিন কাটাইয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহাই তাহার নিবিড় তৃপ্তির মর্ম্মভরা—আঃ।

৫

পরদিন প্রাতঃকালে ননী উঠিয়া গ্রামস্থ লোকজনের সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়া গেল। বধূ তৎপূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া বাসিপাট সারিয়া স্নান করিয়া আসিয়াছিল। শ্বাশুড়ী প্রতিদিনই প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করেন, কিন্তু আজ পরের বাড়ীতে শুইতে গিয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, তাঁহার আসিতে বেলা হইতেছে দেখিয়া বধূ রান্নাঘরে দাওয়ায় দাঁড়াইয়া উনান ধরাইবে কি না ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

সন্তর্পণে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া গেল। বধূ উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিল, শ্বাশুড়ী আসিতেছেন বুঝি ;—না শ্বাশুড়ী নয় দেবর। ছাতা চাদর হাতে গেঞ্জি গায়ে চারুচন্দ্র দ্বারের পাশ হইতে উঁকি দিয়া চারিদিকে চাহিতেছে দেখিয়া ভ্রাতৃজায়া হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই ভয় নেই, এস।"

চারু কুণ্ঠিতভাবে একটু হাসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কই ?"

"দাদা তোমার বেড়াতে বেরিয়ে গেছে, তোমায় এর মধ্যে খবর দিলে কে ঠাকুরপো ?"

"গাঁয়ে ঢুকৃছি, ভট্‌চাজ্‌ মশাই বল্লেন"—বলিয়া চারু রোয়াকে উঠিল। 'শাঙার' উপর ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া গেঞ্জি চাদর ও ছাতাটা ফেলিল। কোঁচার কাপড় খুলিয়া কোমরে ফাঁস দিয়া বাঁধিয়া হাঁটুর কাপড় গুটাইয়া বলিল, "বৌঠান, গাই-দোয়া বোক্নোটা দাও তো, গরুটা আগে দুয়ে নি।"

"ও গো কর্ত্তা থাম। এই এলে, একটু বসে জিরোও।"

চারু লজ্জিতভাবে একটু হাসিল। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বৌঠান, একটা কথা জিজ্ঞেসা কর্‌ব, ঠিক বলবে ?"

বৌঠান বুঝিল কথাটা কি, কষ্টে হাস্য দমন করিয়া বলিল, "কি বল্‌বে বল না ?"

চারু রোয়াকের খুঁটিতে নখের আঁচড় কাটিতে কাটিতে ঘাড় হেঁট করিয়া সলজ্জভাবে বলিল, "আচ্ছা, দাদা কাল আমায় না দেখে কি বল্লে ?"

বধূ কপট গাম্ভীর্য্যে বলিল, "কি আর বলবে, আমি বল্লু তোমার ভাদর বৌয়ের জন্য মন কেমন কর্‌ছিল, তাই দেখা করতে গেছে। শুনে চাট্টি ফুল তুলে একটি মালা গেঁথে বল্লে, যাই ভাইকে দিয়ে আসি।

বেরুচ্ছিল, তা মা বারণ কল্লে, বল্লে 'আওলের দিন পথে সাপ খোপ আছে, রাত্তিরে আর যাস্‌নি।' শুনে আর গেল না। হয় না হয় দেখে এস, তোমার সেই বিয়ের টোপরের মাথায় এখনও যুঁইয়ের মালা টাঙ্গান আছে।"

কুণ্ঠিত হাস্যে চারু বলিল, "সত্যি বল না।"

"আমি মিছে কথা বলছি? আচ্ছা মা আসুক, সুদিও।"

"কি কথা বউ"—বলিয়া গৃহিণী দ্বার ঠেলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বধূ তৎক্ষণাৎ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ মা, ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কাল রাত্তিরে দুগ্‌গোডাঙ্গা যাচ্ছিল না মা?"

"কে ননী তো? হ্যাঁ যাচ্ছিলই তো। আমি বারণ কন্নু তাই গেল না। তোর সঙ্গে ননীর দেখা হয়েছে চারু? তুই কতক্ষণ এসেছিস?"

"আমি এই আস্‌ছি, পথে আসতে আসতে পশ্চিমের মাঠটা ঘুরে দেখে এনু কি না, তাই দেরী হয়ে গেল। ও দু কিতে এবার বেশ ফুলিয়ে উঠেছে। এবার ওখানে খাসা ধান হবে। বৌঠান, বোক্নো দাও, আমি গাই বের করি।"—চারু সেখানে আর দাঁড়াইল না, পাছে ভ্রাতৃ-জায়া মাতার সমক্ষেই আর কিছু ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলিয়া তাড়াতাড়ি সে গোয়ালঘরে ঢুকিল।

গাভী দোহন শেষ হইলে চারু গোয়াল হইতে বলদ দুইটিকে বাহির করিয়া উঠানে বাঁধিল, তারপর ছানি কাটিতে বঁটি লইয়া বসিল। মাতাও ইতিমধ্যে গৃহের অন্যান্য কায সারিয়া গোয়াল মুক্ত করিতে আসিলেন। প্রত্যহ গোশালা পরিষ্কার করিয়া স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের পুণ্য হয়, পল্লী অঞ্চলে এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেই জন্য ইতর ভদ্র

নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বাটীর গৃহিণী, দাসদাসী সত্ত্বেও প্রত্যহ স্বহস্তে গোশালা মার্জ্জন করিয়া থাকেন।

ভীমপরাক্রমে ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ করিয়া প্রচুর পরিমাণে খড় কাটিয়া, ভিজা খইল মাখাইয়া গরুকে জাব দিয়া, দুই হাতে প্রকাণ্ড দুই বাল্‌তী লইয়া খিড়কির ঘাট হইতে জল তুলিয়া আনিয়া, গরুর ডাবা ভর্ত্তি করিয়া দিয়া, ঘাট হইতে হাত পা ধুইয়া আসিয়া গামছায় দেহের ঘাম মুছিতে মুছিতে চারু বাড়ী ঢুকিল। ধীরে সুস্থে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া রান্নাঘরের দাওয়ার নিকট আসিয়া বলিল, "বৌঠান একটু আগুন দাও!"

বৌঠান তখন হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়া উনানে জ্বাল ঠেলিয়া বঁটি লইয়া বসিয়া তরকারী বনাইতেছিল। দেবরের কথায় বঁটি হইতে উঠিয়া উনান হইতে একখানা জলন্ত কাঠ বাহির করিয়া দেবরের সম্মুখে সরাইয়া দিল। চারু কাঠখানা ঠুকিয়া কতকগুলা জলন্ত অঙ্গার ভাঙ্গিয়া লইয়া সেটা আবার ফিরাইয়া দিল। কলিকায় আগুন তুলিয়া ফুঁ দিতে দিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "বৌঠান সত্যি কথা বলবে?"

"কি বলব, বল না ভাই।"

"না তামাসা নয়, সত্যি সত্যি বলতো বলি।"

চারুর কথার ভিতর একটা অনুনয়ের কাতরতা ফুটিয়া উঠিল। স্নেহবিগলিত-হৃদয়া বৌঠান তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভুলিয়া সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না না ঠাকুরপো, আমি তোমায় রাগাচ্ছিনু। তোমার দাদা কিছু বলে নি।"

বৌঠানের কথার মধ্যে পরিহাসের গন্ধ নাই দেখিয়া আশ্বস্ত চারুচন্দ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি বল্‌ছ, দাদা রাগ করে নি?"

"ক্ষেপেছ তুমি; পাগল! এর ভেতর রাগ করবার কি আছে?

তবে বাড়ী এসে আদুরে ছোট ভাইটির মুখখানি না দেখে মনটা বোধ হয় একবার কেমন কেমন করেছিল, তাই একবার দুগ্‌গোডাঙ্গা যাবার ঢেউ উঠেছিল। তা সেও তখুনি থেমে গেছল, মার কাছে আর কিছু বলে নি।"

"তোমার কাছে ?"

"আমার কাছে ?"—বৌঠান হাসিল, বেগুন বনাইয়া বেগুনের ভিতরটা পরীক্ষা করিতে করিতে উত্তর দিল—"আমার কাছে যদি কিছু বলে থাকে সেটা নেই বা শুন্‌লে ঠাকুরপো। তবে মনে রেখো, তার জবাবও তোমার দাদা পেয়েছে।"

"দুটো একটা কথা শুনতে পাই না বৌঠান!"

"শুনবে, আচ্ছা একটা কথা বলি শোন—" বলিয়া ভ্রাতৃজায়া মাঘ মাসে ছোট বধূর আনয়ন ও গৃহনির্ম্মাণ বিষয়ক আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া গেল। চারু হুঁকা আনিবার জন্য আর উঠিতে পারিল না, সেইখানেই বসিয়া দুই হাতে কলিকা টানিতে টানিতে সাগ্রহে গল্পটা শুনিল।

এই দুইটি দেবর ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে বয়সের পার্থক্য খুব বেশী ছিল না, কিন্তু 'একলার ঘর' বলিয়া বধূ বয়সে দেবরের অপেক্ষা দুই চারি বছরের ছোট হইলেও কথা কহিত,—কেন না, না কহিলে চলিবে না। মান বাঁচাইয়া কথা কহিতে জানিলে কাহারও সহিত কথা দূষণীয় নহে। এই দুইটি দেবর ও ভ্রাতৃজায়া, পরস্পরের পরিহাস-সম্পর্কীয় হইলেও,—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি গভীর স্নেহের অন্তরঙ্গতা ছিল। চারুচন্দ্র যে আব্‌দার মাতা ও ভ্রাতার নিকট জানাইতে সঙ্কুচিত হইত, সে আবেদন বৌঠানের নিকট স্বচ্ছন্দে জানাইয়া, পূর্ণ বিশ্বাসে তাঁহার শরণাগত হইতে দ্বিধা বোধ করিত না,—'বৌঠান'ও তাই নিশ্চিন্ত-নির্ভরশীল দেবরটির ভার পরম যত্নে বহন করিত। তা ছাড়া আর একটা